তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি
এবং
চারটি নীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ

মূল লেখক
শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব
(রহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখ্যাকার :
শাইখ হাইছাম বিন মুহাম্মাদ জামিন সারহান
শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম,মাসজিদ নাববী, মাদীনা

বাংলা ভাষান্তর :
কাওসার এরশাদ
অধ্যায়নরত
মাদানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি এবং চারটি নীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ

আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি
প্রকাশ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে ক্ষমা করুন -আমীন।

http://attassee1-alelmi.com

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি এবং চারটি নীতির ব্যাখ্যাগ্রন্থ

মূল লেখক

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব
(রহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখ্যাকার

শাইখ হাইছাম বিন মুহাম্মাদ জামিল সারহান
শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী, মাদীনা

http://attasseel-alelmi.com

বাংলা ভাষান্তর

কাওসার এরশাদ
অধ্যয়নরত
মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি প্রকাশ করতে
যারা সহযোগিতা করেছে সকলকে ক্ষমা করুন-আমীন।

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি

بسم الله الرحمن الرحيم

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জীবনের অনিষ্ট ও আমাদের খারাপ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

ব্যাখ্যাসংশ্লিষ্ট ভূমিকা:

মূল গ্রন্থের লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রবক্তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী। ডাক নাম আবুল হুসাইন। তিনি ১১১৫ হিজরীতে (সৌদী আরবের) উয়াইনাহ নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে দিরইয়াহ নামক স্থানে মারা যান।

আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করব?

১. কেননা আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।	২. আল্লাহ তাওহীদ ব্যতীত কোন আমল গ্রহণ করবেন না।
৩. কেবল এককত্ব ঘোষণাকারীই জান্নাতে প্রবেশ করবে।	৪. তাওহীদ অধিক সাওয়াব পাওয়ার একটি মাধ্যম।
৫. তাওহীদ অধিক পাপ মোচনের একটি মাধ্যম।	৬. তাওহীদ নিরাপত্তা ও হেদায়াত পাওয়ার একটি মাধ্যম।
৭. তাওহীদ প্রশান্তি পাওয়ার একটি মাধ্যম।	৮. তাওহীদ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশ পাওয়ার একটি মাধ্যম।

শিক্ষার্জনের শুরুতেই এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটি চয়নের কারণ

সালফে সালেহীন ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের আলেমবৃন্দ এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটি চয়ন করেছেন। কেননা এ (মতন বা মূল পাঠ) বইটিতে অনেক উপকারিতা ও ফায়েদা রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ছাত্র তার জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং এর উপরেই ভিত্তি করে শরীয়তের জ্ঞানার্জন করতে পারে। সুতরাং আমরা তাদের আদর্শ গ্রহণ করছি ও নীতিমালায় তাদের পথ অনুসরণ করছি।

যেমনভাবে সর্বসাধারণও এ মতনটি (মূল পাঠ) ও তার অধীনস্থ এমন কতিপয় মূলনীতির আবশ্যিকভাবে মুখাপেক্ষী যেগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ঈমান আনা অপরিহার্য।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ)'র এই গ্রন্থ ও অন্যান্য বইয়ের বৈশিষ্ট্য

১. সহজবোধ্য ও স্পষ্ট	২. প্রমাণসহ মাসআলার আলোচনা	৩. মাসআলাসমূহকে একত্রিতকরণ ও সংখ্যা সহকারে বিন্যাস। অতঃপর তা থেকেই ব্যাখ্যা প্রদান।	৪. লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এর পাঠ্যসমূহের পাঠকবৃন্দ ও শ্রোতাদের জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ।

তিনটি মূলনীতির পরিচয়

তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়: কবরের তিনটি প্রশ্ন

- তোমার প্রতিপালক কে?
- তোমার ধর্ম কী?
- তোমার নাবী কে?

তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে আমাদের কী উপকার রয়েছে?

তুমি যখন তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে ও তদনুপাতে আমল করবে, দাওয়াত দিবে এবং জ্ঞানার্জন করা, আমল করা কিংবা দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে, তখন তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

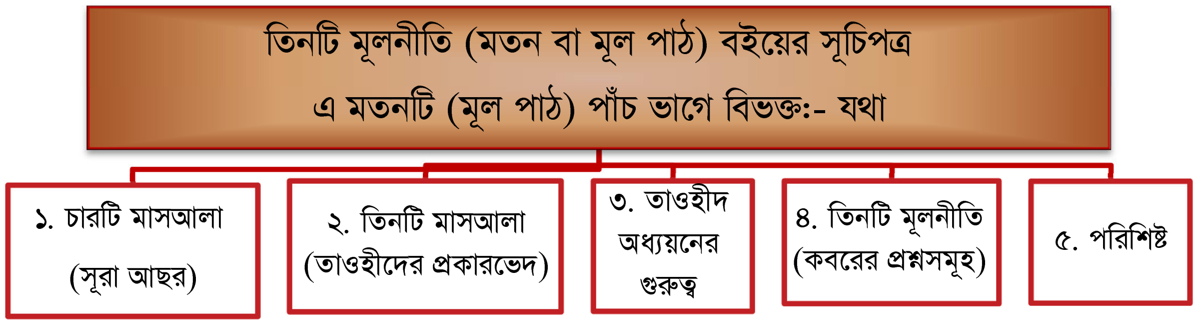
তিনটি মূলনীতি (মতন বা মূল পাঠ) বইয়ের সূচিপত্র
এ মতনটি (মূল পাঠ) পাঁচ ভাগে বিভক্ত:- যথা
১. চারটি মাসআলা (সূরা আছর)
২. তিনটি মাসআলা (তাওহীদের প্রকারভেদ)
৩. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব
৪. তিনটি মূলনীতি (কবরের প্রশ্নসমূহ)
৫. পরিশিষ্ট

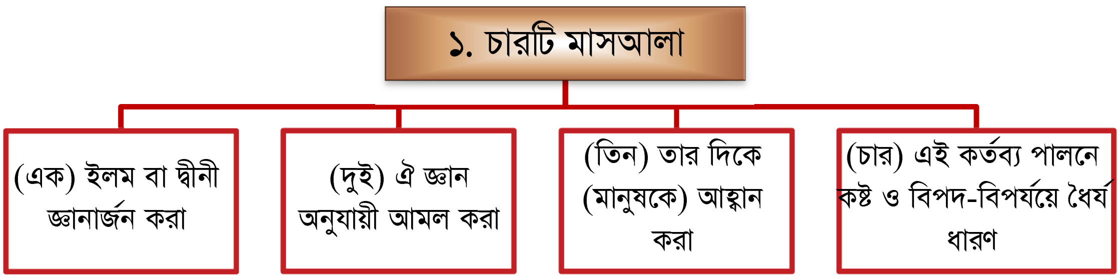
১. চারটি মাসআলা
(এক) ইলম বা দ্বীনী জ্ঞানার্জন করা
(দুই) ঐ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা
(তিন) তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা
(চার) এই কর্তব্য পালনে কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ

২. তিনটি মাসআলা

- ১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত (প্রভুত্ব ও নাম এবং গুণসমূহের এককত্ব প্রদান)
- ২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ
- ৩. শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা (অন্তর,জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে)

৩. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব

প্রশ্নোত্তর: আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করব?

৪. তিনটি মূলনীতি

তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়: কবরের তিনটি প্রশ্ন

- তোমার প্রতিপালক কে?
- তোমার ধর্ম কী?
- তোমার নাবী কে?

৫. পরিশিষ্ট

লেখক (রহিমাহুল্লাহু) এর উক্তি হতে: (মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে----------) (মতন বা মূল পাঠ) বইয়ের শেষ পর্যন্ত।

প্রথমত: চারটি মাসআলা

بسم الله الرحمن الرحيم
জেনে রেখ-আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন![১] চারটি মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২]

(প্রথম) ইলম বা দ্বীনী জ্ঞান: আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

(দ্বিতীয়) ঐ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা।[৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই মতনটি (মূল পাঠ) বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার কারণ

১. আল্লাহর কিতাব ও নাবীদের অনুসরণার্থে	২. তাঁর (লেখক) পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন আলেমগণকে আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করে, কেননা তাঁরা তাদের লিখন বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন	৩. আল্লাহর সম্মানিত নামের বরকত নেয়ার জন্য

(২) যেমনভাবে আমরা ভূমিকাতে বলেছি: লেখকের একটি বিশেষ গুণ হলো ছাত্রদের জন্য দু'আ দিয়ে শুরু করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করেন। আর তা প্রমাণ করে যে-

১. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের আলেমগণ তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।	২. নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম মূলত রহমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

العلم বা বিদ্যার পরিচয়: العلم বা বিদ্যা হলো সত্যকে দলীলসহ জানা। আর এর বিপরীত হলো অজ্ঞতা বা মূর্খতা।

(৩) ইলম ও আমলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়: ইলম আমলকে আহ্বান করে যদি সাড়া দেয়া হয়, অন্যথায় তা চলে যায়।

সুতরাং আমল ব্যতীত ইলমের কোন উপকারিতা নেই। যখন কেউ বিদ্যার্জন করবে তখন তার উপর করণীয় হলো: উক্ত ইলম অনুযায়ী আমল করা। অন্যথায় তার মাঝে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা ইয়াহুদীদের নিকট ইলম ছিল, কিন্তু তারা আমল করত না।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمُ ﴾ [الأنعام: ٢٠] অর্থ:তারা তাকে চিনতো যেমন তাদের পুত্রদেরকে চিনতো। [সূরা আল আন'আম : ২০]

আর যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো ঐ আলেম যে বিদ্যার্জন করল কিন্তু আমল করল না।

যেমন একজন কবি বলেছেন:

যে আলেম ইলম অনুযায়ী আলম করে না, তাকে মূর্তি পূজকদের পূর্বে শাস্তি দেয়া হবে।

(তৃতীয়) উক্ত জ্ঞানের দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নীতিমালা আছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

১. দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে

২. দাওয়াতের ভিত্তি হবে শারয়ী ইলমের উপর

৩. হেকমত ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দেয়া

৪. আহ্বানকৃত ব্যক্তিদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা

এই শর্তসমূহের দলীল:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

অর্থ: আপনি বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সূরা ইউসুফ :১০৮]

قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِي: এতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীয়ত হতে নিয়ে এসেছেন। আর سَبِيل অর্থ: পথ বা পদ্ধতি। أَدْعُو إِلَى اللَّهِ : সেই ব্যক্তি আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বানকারী যে মানুষকে আল্লাহর দিকে পৌঁছে দেয়। عَلَى بَصِيرَةٍ : بَصِيرَةٍ হলো জ্ঞানার্জন করা। এখানে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

১. শারয়ী জ্ঞান।	২. আহ্বানকৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।	৩. গন্তব্যে পৌঁছানোর আহ্বানকারীর উদ্দেশ্য।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে বলতে চাচ্ছেন: যখন তুমি কোন বিদ্যার্জন করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তখন তোমার প্রতি কর্তব্য হচ্ছে সেই পথে চলা যে পথে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা এবং সালফে সালেহীনগণ চলেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ

অর্থ: আপনি বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াত দেই।

সুতরাং এখানেই বুঝা যাচ্ছে যে, দাওয়াত প্রদান করা আবশ্যক।

(চতুর্থ) ধৈর্য অর্থাৎ এ সমস্ত কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা।[১]

উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ... وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ٣ ﴾

[العصر: ١، ٣]

অর্থ: ‘‘কালের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে হক্ব তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।’’[২]

[সূরা আল-আসর :১-৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দাওয়াতের পর ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তোমাকে বলতে চাচ্ছেন: যে ব্যক্তি এই দাওয়াতের পথে চলবে তার অনেক কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয় আসবে, যেমন নাবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রেও এসেছিল। সুতরাং এ সকল কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক।

الصبر বা ধৈর্যের পরিচয়

- **শাব্দিক অর্থ:** আটকে রাখা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** সৎ আমলের উপর আত্মাকে অবিচল রাখা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) ধৈর্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন

১. আল্লাহর আনুগত্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা

২. আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজ হতে বিরত থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করা

৩. আল্লাহর নির্ধারিত বেদনাদায়ক ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা

(২) চারটি মাসআলা উল্লেখ করার পর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত মাসআলার উপর কুরআন হতে দলীল প্রদান করেছেন। আর তা হচ্ছে সূরা আছর।

প্রশ্ন: লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কেন সর্বদাই দলীলসহ মাসআলা উল্লেখ করেন?

উত্তর:

১. তিনি যেন একজন ছাত্রকে তাকলীদহীন ইত্তেবা বা আনুগত্যের উপর গড়ে তুলতে পারেন

২. যাতে ছাত্রের নিকট দলীল থাকে এবং উক্ত দলীলের মাধ্যমে মতানৈক্যকারীদের উত্তর দিতে পারে

৩. মূল দলীলের ভিত্তিতে ছাত্র যেন মাসআলার হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়

উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফে‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) এ অভিমত পেশ করেছেন যে, ‘‘যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর প্রমাণ পেশ করার জন্য এ সূরা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু অবতীর্ণ নাও করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।’’(১)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সংকলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: বলা ও আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা। (২)

এর সমর্থনে দলীলঃ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ﴾ [محمد: ١٩]

অর্থ: ‘‘কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনোই ইলাহ নেই। আর (রাসূল) নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ও মু‘মিন নর-নারীর জন্যও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।’’ (সূরা মুহাম্মাদ :১৯)

সুতরাং আল্লাহ এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই প্রথমে উল্লেখ করেছেন। (২)

(১) ইমাম শাফে‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ)’র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, নিশ্চয় এ সূরাটি এককভাবে মানব জাতির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম যে, যেন তারা বিদ্যার্জন করে অতঃপর আমল করে এবং দাওয়াত দেয় ও সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে।

সুতরাং কুরআনের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে তোমার কী অভিমত? বরং পূর্ণ কুরআনই দলীল ও প্রমাণ।

(২) আমীরুল মু‘মিনীন ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহুল বুখারী হাদীস গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও কাজের পূর্বে এবং তিনি এর দলীলও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কথা ও কাজের পূর্বেই বিদ্যার্জন আবশ্যক।

তাই ইলম ব্যতীত কারো আমল পরিশুদ্ধ হয় না, অন্যথায় তার মাঝে খৃষ্টানদের সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: তিনটি মাসআলা

জেনে রেখ, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং তদনুযায়ী আমল করা অবশ্য কর্তব্য।[১]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) মতনের (মূল পাঠ) এ অংশটি ছাত্রদের জন্য দু'আ দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি 'তিনটি মূলনীতি' বইটিতে ছাত্রের জন্য তিন স্থানে দু'আ করেছেন:
১. চারটি মাসআলার শুরুতে।
২. তিনটি মাসআলার শুরুতে।
৩. তৃতীয় স্থানটি হলো, জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন, নিশ্চয় একনিষ্ঠ দ্বীন হচ্ছে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাত।

তিনটি মাসআলার ব্যাখ্যার পূর্বে কিছু কথা

তাওহীদ এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস। যখন কেউ কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে

পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা

তাওহীদ তিন প্রকার

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ : আল্লাহর সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ : ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত : আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নাম বা গুণাবলী নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর এককত্ব ঘোষণা করা। আর তা হচ্ছে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত : কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল আসমা ওয়াস সিফাত এর নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিমাবদ্ধ থাকা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করেছেন তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

অর্থ: তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা আচ্ছন্ন করতে পারে না। (সূরা আল বাকারাহ: ২৫৫)

﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨]

অর্থ: ''আর আমাকে কোন প্রকার ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।'' (সূরা ক্বাফ: ৩৮)

এ তিনটি মাসআলা হচ্ছে :

প্রথম মাসআলা: আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]

অর্থ: ''নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফের'আউনের প্রতি। কিন্তু ফের'আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে।''(১) (সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৫-১৬)

তিনটি মাসআলার সারাংশ:

- প্রথম মাসআলা: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত
- দ্বিতীয় মাসআলা: তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ
- তৃতীয় মাসআলা: শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম মাসআলাটিতে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে সাব্যস্ত করেছেন। (নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন) সুতরাং তিনিই সৃষ্টিকর্তা, (আল্লাহ আমাদেরকে রিযিক দান করেন) সুতরাং তিনিই রিযিকদাতা। (তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি) অর্থাৎ তাঁর কোন আদেশ ও নিষেধ অমান্য না করা হয় (বরং তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন)।

রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণের উদ্দেশ্য:

১. সৃষ্টির উপর দলীল সাব্যস্ত করা:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

(سورة بني إسرائيل:١٥)

অর্থ: কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৫)

২. রহমত বা দয়া-অনুকম্পা:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الأنبياء: ١٠٧)

অর্থ: আমি আপনাকে বিশ্ববাসির জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

দ্বিতীয় মাসআলা: ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাকেও তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

[الجن: ١٨]

অর্থ: "নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা আল-জ্বিন: ১৮)

দ্বিতীয় মাসআলাটিতে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশিদার করাকে তিনি পছন্দ করেন না। أحدا শব্দটি অনির্দিষ্ট। এটি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। সে কোনো নাবী হোক, ওলী হোক, ফেরেশতা হোক, কোন সৎ বান্দা বা অন্য কোনো সৃষ্টি যেই হোক না কেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨]

অর্থ: "নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা আল-জ্বিন: ১৮)

মাসজিদের প্রকৃত অর্থ কী এ সম্পর্কে তিনটি মতামত রয়েছে, সবগুলোই একত্রিতকরণ সম্ভব

১. এমন মাসজিদসমূহ যেগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে

২. সেজদাহ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

৩. পৃথিবী: [রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সমগ্র ভূমিকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে]

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا এখানে أَحَدًا শব্দটি অনির্দিষ্ট যা নিষেধসূচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্যে লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দ্বিতীয় মাসআলার শুরুতে বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশিদার স্থাপন করা পছন্দ করেন না। অর্থাৎ সে কোন নাবী, ওলী, জ্বীন বা কোন সৎ বান্দা যেই হোক না কেন।

তৃতীয় মাসআলা: যিনি রাসূলের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন, তার পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মোটেই জায়েয নয় যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী ঐ লোকেরা যদি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপিও নয়।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

অর্থ: "আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে ঈমান পোষণকারী এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে- হোক না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র-গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর। বস্তুত এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।"

(সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২)

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তৃতীয় মাসআলায় এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা আবশ্যক ।

শিরক এবং মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকতে হবে

- ১. অন্তরের মাধ্যমে
- ২. জিহ্বার মাধ্যমে
- ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে

১. অন্তরের মাধ্যমে: তা হচ্ছে, কাফেরকে ঘৃণা করা, তাদের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানকে অপছন্দ করা এবং বিশেষ করে তাদের শিরক ও বিদআতী কার্যকলাপ ঘৃণা করা।

২. জিহ্বার মাধ্যমে: إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ [الزخرف: ٢٦] অর্থ: "তোমরা যার ইবাদত করছো নিশ্চয় আমি তা হতে মুক্ত।" (সূরা আয যুখরুফ : ২৬)

﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾﴾ [الكافرون: ١-٦]

অর্থ: "আপনি বলুন, হে কাফেরেরা, তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর। তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। (সূরা কাফিরুন: ১-৬)

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে: তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করা অথবা তাদের পোশাকের সদৃশ পোশাক পরিধান না করা এবং তাদের আক্বীদাহগত বিষয়ে অংশগ্রহণ না করা।

তৃতীয়: তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব

জেনে রেখ, (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্য তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয় একনিষ্ঠ আনুগত্যই হল মিল্লাতে ইবরাহীম:

তা এই যে তুমি কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কেবল তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করবে। আর আল্লাহ সকল মানুষকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦]

অর্থ: ‘‘আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।’’[১] (সূরা আয- যারিয়াত: ৫৬)

তারা আমারই ইবাদত করবে -এর অর্থ, তারা আমারই উলূহিয়্যাত্বর এককত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

আর আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি হচ্ছে তাওহীদ। যার অর্থ সর্বপ্রকারের ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে তাঁর বড় নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ: আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহ্বান করা।[১]

الحنيفية এর পরিচয়

শাব্দিক পরিচয়: الحنيفية শব্দটি حنفথেকে গৃহিত। যার অর্থ ধাবিত হওয়া।

পারিভাষিক পরিচয়: ঐ মিল্লাতকে বলা হয়, যা শিরক থেকে বিমুখ হয়ে ইখলাস, তাওহীদ ও ঈমানের দিকে ধাবিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا [النحل: ١٢٠]

অর্থ: (ইবরাহীম ছিলেন) আল্লাহরই অনুগত একনিষ্ঠ বান্দা। (সূরা নাহল: ১২০)

অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আগমনকারী ও শিরক হতে পশ্চাদপ্রণকারী। সুতরাং حنيف বা একনিষ্ঠ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সর্বদাই তাওহীদের দিকে ফিরে আসে এবং শিরক হতে দূরে থাকে।

(৩) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এখানে সুস্পষ্ট করেছেন, আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো। আর পূর্বেই আমরা তাওহীদের গুরুত্ব আলোচনা করেছি।

তাওহীদ এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস। যখন কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে।

পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলছেন: তারা আমার ইবাদত করবে এর অর্থ হলো: তারা আমার এককত্ব ঘোষণা করবে। আর এটিই ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। যেমন তিনি বলেছেন: কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি ইবাদতের অর্থ হলো তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণা করা। (তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা কর।হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদের ঘোষণা কর।

চতুর্থত: তিনটি মূলনীতি

সুতরাং যদি তোমাকে বলা হয়, যে তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য তা কী কী?

তুমি উত্তর দেবে যে, বিষয় তিনটি হলো:

মানুষের কর্তব্য তার রব সম্পর্কে, তাঁর দ্বীন সম্পর্কে এবং তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।(১)

যদি তোমাকে বলা হয়, ‘‘তোমার রব কে?„ তা হলে বল, আমার রব সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নে‘য়ামতসমূহ দ্বারা লালন-পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র মা‘বুদ, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোনো মা‘বুদ নেই।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفاتحة: ٢]

অর্থঃ ‘‘যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।’’(২) (সূরা আল- ফাতিহা: ১)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র।(৩)

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তিনটি মূলনীতি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যার সারাংশ কবরের তিনটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠক ও শ্রোতাকে সচেতন করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন।

(২) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম মূলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহই প্রতিপালক এবং তিনিই ইবাদতের যোগ্য অধিকারী। তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে দলীল দিয়েছেন:

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفاتحة: ٢]

অর্থঃ ‘‘যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।’’ (সূরা আল- ফাতিহা: ১)

সুতরাং প্রতিপালকই মা‘বুদ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এ আয়াতটি তাওহীদের তিনটি প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

১. اَلْحَمْدُ এ শব্দটিতে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে সাব্যস্ত করা।

২. لِلّٰهِ এ শব্দটিতে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহকে সাব্যস্ত করা।

৩. رَبِّ এ শব্দটিতে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে সাব্যস্ত করা।

(৩) অর্থাৎ: আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি। সুতরাং আমি যেহুত একজন সৃষ্ট বস্তু তাই আমার জন্য কর্তব্য হলো সৃষ্টিকর্তা ও অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ দাতার শুকুর গুজার করা।

আর যদি তোমাকে বলা হয়, ‘‘তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছো?’’ তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার প্রতিপালককে চিনেছি)। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র আর তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে সাত আকাশ, সাত জমিন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: ٣٧]

অর্থ: ‘‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক।’’(সূরা ফুসসিলাত: ৩৭)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ [الاعراف: ٥٤]

অর্থ: ‘‘নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তারা ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগতরূপে। জেনে নাও, সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক তো তিনিই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়।" [১] (সূরা আল-আ‘রাফ: ৫৪)

আর যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা‘বুদ বা উপাস্য।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ٢١، ٢٢]

অর্থ: ‘‘হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে করেছেন বিছানাস্বরূপ আর আসমানকে করেছেন ছাদস্বরূপ। আর যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদ্গাত করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব তোমরা জেনে শুনে কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করোনা।’’[২] (সূরা আল-বাকারাঃ ২১-২২)

ইবনে কাসীর বলেছেন, ‘‘যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।’’[৩]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বেশ কিছু সৃষ্টিগত নিদর্শন ও সৃষ্টিসমূহকে উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় এবং তা সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোনো প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও মা'বুদ নেই। আর এর স্বপক্ষে তিনি প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন যেমনটি তা মূল বইয়ে উল্লেখিত।

* প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন বা প্রমাণ। কিন্তু শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নিদর্শন ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করেছেন। কেননা নিদর্শনসমূহ পরিবর্তন হয়। যেমন দিন-রাত। সুতরাং যা পরিবর্তন হয় তাতে প্রমাণ পাওয়া যায় শক্তি তারই বেশি যা পরিবর্তন হয় না।

(২) এ আয়াতখানা সূরা বাকারার। কতিপয় আলেম বলেছেন: কুরআনের মধ্যে এ (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ) আয়াতটিতে সর্বপ্রথম আহ্বানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতেই সর্বপ্রথম আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। (ٱعۡبُدُواْ) অর্থাৎ তোমরা এককত্ব ঘোষণা কর; এবং উক্ত আয়াতেই সর্বপ্রথম নিষেধসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ অর্থাৎ- তোমরা শিরক হতে মুক্ত থাক।

(৩) অর্থাৎ তাওহীদুর রুবুবিয়্যার এককত্ব ঘোষণাকারীর উপর কর্তব্য হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যার ক্ষেত্রেও এককত্ব ঘোষণা করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সব ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন: তা হচ্ছে,

১. ইসলাম (আত্মসমর্পন করা)।

২. ঈমান (স্বীকৃতি দেয়া তথা অন্তর, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মেনে নেয়া)।

৩. ইহসান (সার্বিক সুন্দরতমভাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা)।

৪. الدعاء (আদ-দু'আ) প্রার্থনা, আহ্বান।

৫. الخوف (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি।

৬. الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ক্ষা।

৭. التوكل (আৎ-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা।

৮. الرغبة (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

৯. الرهبة (আর-রাহ্বাহ) শঙ্কা।

১০. الخشوع (আল-খুশূ') বিনয়-নম্রতা।

১১. الخشية (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া।

১২. الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

১৩. الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

১৪. الاستعاذة (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১৫. الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা।

১৬. الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা।

১৭. النذر (আন্-নযর) মান্নত করা ইত্যাদি।

এগুলোসহ আরও যেসব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا [الجن: ١٨]

অর্থ: ''আর মাসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই আহ্বান করবে না।'' (সূরা আল-জিন: ১৮)

সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটি কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ [المؤمنون: ١١٧]

অর্থ: ''যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করে, তার নিকট যার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামাণ নেই তার হিসেব-নিকেশ হবে তার রবের কাছে, নিশ্চয় কাফের লোকেরা কখনই সফলকাম হবে না।'' (সূরা মু'মিনূন: ১১৭)

তাছাড়া হাদীসে এসেছে,

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

অর্থ: দু'আ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ।

দু'আর ব্যাপারে আল্লাহর বাণী,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [الغافر: ٦٠]

অর্থ: ''আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।'' (সূরা গাফির: ৬০)

* লেখক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ)'র উক্তির পরে প্রত্যেকটি দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতকে কুরআন হতে দলীলসহ উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আসছে।

الدعاء (আদ-দু‘আ) প্রার্থনা, আহ্বান:
এটি দু’ প্রকার:

১. ইবাদতের মাধ্যমে দু‘আ করা। তা হচ্ছে কাজের মাধ্যমে দু‘আ বা প্রার্থনা করা। যেমন : সলাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা ও হজ্জ সম্পাদন করা ইত্যাদি।

এ ইবাদতগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বড় শিরক।

২. চাওয়ার মাধ্যমে দু‘আ করা। তা হচ্ছে কথার মাধ্যমে দু‘আ করা। যেমন:

اغفرلي- আমাকে ক্ষমা করুন।

ارحمني - আমাকে দয়া করুন ইত্যাদি।

এর হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর তা দু' প্রকার যা পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

চাওয়ার মাধ্যমে দু‘আ করা দু’ প্রকার।

১. যে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমতা রাখেন তা অন্যের নিকট দু‘আ বা প্রার্থনা করা বড় শিরক।

২. যে ব্যাপারগুলোতে বান্দা ক্ষমতা রাখে সে ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে তার নিকট চাওয়া জায়েয আছে।

শর্তসমূহ:

- ১. আহ্বানকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকা। এ শর্তের কারণে মৃত ব্যক্তির নিকট চাওয়া যাবে না।
- ২. আহ্বানকৃত ব্যক্তি উপস্থিত থাকা। এ শর্তের কারণে অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট চাওয়া যাবে না।
- ৩. আহ্বানকৃত ব্যক্তি সেক্ষেত্রে সক্ষম হওয়া। এ শর্তের কারণে অপারগ ব্যক্তির নিকট চাওয়া যাবে না।
- ৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, আহ্বানকৃত ব্যক্তি কেবল মাধ্যম হতে পারে তবে তার স্বত্ত্বাগত কোন ক্ষমতা নেই।

* সুতরাং যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আহ্বানকৃত ব্যক্তির সৃষ্টির পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে এবং সে উপকার ও অপকার করতে পারে তাহলে এটি হবে শিরক।

বি:দ্র:

আমরা আমলের বিধান সম্পর্কে অধ্যয়ন করছি। কিন্তু আমলকারীর উপর হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে দূরে থাকতে হবে।

আর আলেমগণ আমলকারীর উপর হুকুম দিবে যে, সে মু’মিন বা কাফের।

মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার:

১. সে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন সে তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে । ইহা শরীয়তসম্মত।

ইহা দু' প্রকার:

ক. শরীয়তসম্মত মাধ্যম। যেমন: শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁক করা।কেননা আল্লাহ তা'আলা ঝাড়ফুঁককে রোগমুক্তির শারয়ী মাধ্যম বানিয়েছেন।

খ. অনুভূতি সম্বন্ধনীয় মাধ্যম। যেমন: ঔষধ সেবন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঔষুধকে আরোগ্যের মাধ্যম করেছেন।

২. দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ যাকে মাধ্যম করেননি তাকে মাধ্যম করে। আর এটি ছোট শিরক।

৩. তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখে যে, সে নিজেই ক্রিয়াশীল এবং তার হাতেই রয়েছে ভাল ও মন্দ করার শক্তি। আর এটি বড় শিরক।

الدعاء مخ العبادة অর্থ: দু'আ ইবাদতের সারাংশ হাদীসটি যঈফ। কিন্তু রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ উক্তিটি সহীহ الدعاء هو العبادة অর্থ: দু'আই হচ্ছে ইবাদত।

দু'আ কিভাবে ইবাদত হয়?

এ আয়াতটি তার প্রমাণ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [الغافر: ٦٠]

অর্থ: তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত হতে বিমুখ হয়, তারা অচিরেই জাহান্নামের অতল গভীরে প্রবেশ করবে।" (সূরা আল গাফির: ৬০)

এ আয়াতটি দু'আ ইবাদত হওয়ার প্রমাণ ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: عِبَادَتِي

সুতরাং এটিই দলীল যে, নিশ্চয় দু'আ হচ্ছে ইবাদত।

الخوف (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি:
ভয় করা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [آل عمران: ١٧٥]

অর্থ: "অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক।"[১] (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ক্ষা:
আশা করা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف: ١١٠]

অর্থ: "অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্ম করে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।"[২] (সূরা কাহাফ: ১১০)

(১) الخوف বা ভয়-ভীতি: এটি একটি প্রতিক্রিয়া যার দ্বারা মৃত্যু, ক্ষতি ও কষ্টের সম্ভাবনা থাকে।
আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চরদের ভয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ভয় তিন প্রকার:

১. ইবাদত, সম্মান প্রদান ও গোপনে ভয় করা।
আর তা হচ্ছে বান্দা তার মা'বুদকে ভয় করবে। এক্ষেত্রে সে মা'বুদের জন্য নম্র, বিনয়ী হবে ও সম্মান প্রদান করবে। এটা ওয়াজিব বা আবশ্যক। ইহা অন্যের জন্যে সম্পাদন করা বড় শিরক।

২. স্বভাবগত ভয়।
যেমন একজন মানুষ আগুন, শত্রু ও হিংস্র প্রাণীকে ভয় পায়। এটি বৈধ বা জায়েয।

৩. লংঘনজনিত ভয়।
যেমন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা। এটি হারাম।

(২) الرجاء বা আশা-আকাঙ্ক্ষা:
তা হলো নিকটবর্তী কাজে প্রাপ্তির ব্যাপারে মানুষের আশা প্রকাশ করা। কখনো কখনো তা দূরবর্তী কাজের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। আর বিনয়সম্পৃক্ত আশা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য হবে। এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করা বড় শিরক।

প্রশংসাযোগ্য আশা কেবল তার জন্য হবে যে, আল্লাহর আনুগত্যের আমল করে এবং পুণ্যের আশা করে অথবা অবাধ্য কাজ হতে তাওবা করে এবং তাওবা কবুলের আশা রাখে। পক্ষান্তরে আমল ব্যতীত আশা করা এক প্রকার প্রতারণা ও নিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা।

(১) التوكل(আত-তাওয়াক্কুল) এর পরিচয়

শাব্দিক পরিচয়: কোন কিছুর উপর ভরসা করা।

পারিভাষিক পরিচয়: শরীয়ত সম্মত ভায়া গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখাকে التوكلবা ভরসা বলে।

التوكل (আত-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা:

নির্ভরশীলতা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [المائدة: ٢٣] .

অর্থ: “আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু‘মিন হও।” (সূরা মায়েদাহ্‌ঃ ২৩)

আল্লাহ আরও বলেছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ [الطلاق: ٣] .

অর্থ:“আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।” (১) (সূরা তালাকঃ ৩)

التوكل বা ভরসার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আবশ্যক

- আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ভরসা করা।
- পূর্ণ আস্থা রাখা যে, আল্লাহ যা ওয়াদা করেছেন তা তিনি বাস্তবায়ন করবেন।
- শরীয়ত সম্মত মাধ্যম গ্রহণ করা।

الرغبة বা অনুরাগ, আগ্রহ, **الرهبة** বা শঙ্কা, **الخشوع** বা বিনয়-নম্রতা;

আগ্রহ, ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ [الانبياء: ٩٠]

অর্থ: “নিশ্চয়ই এরা সৎ কর্মে ত্বরিৎ ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয়সহকারে আমাকে আহ্বান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়ী-বিনম্র।” (২)

(সূরা আম্বিয়া: ৯০)

(২) الرغبة (আর-রাগবাহ) বা অনুরাগ: প্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছার ভালবাসা রাখা।

الرهبة (আর-রাহবাহ) বা শঙ্কা: ভীতিকর বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ভয় করা। সুতরাং তা হলো আমলসহ ভয় করা।

الخشوع (আল-খুশুউ) বা বিনয়-নম্রতা: আল্লাহর সম্মানার্থে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করা। আর সেটি হলো আল্লাহর সকল ফায়সালাকে মেনে নেওয়া।

* সকল অবস্থায় আল্লাহর পথের পথিক ভয় ও আশাকে একত্রিত করে। একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয় না। অন্যথায় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর নিকট ভয় ও আশা করার বিষয়ে পাখির দু’টি ডানার মত সমতা থাকা আবশ্যক।

الخشية (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া:

ভীত-শঙ্কিত থাকা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ [البقرة: ١٥٠]

অর্থ: ‘‘সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।’’ (১) (সূরা আল- বাকারা: ১৫০)

الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা:

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ [الزمر: ٥٤]

অর্থ: ‘‘আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এস এবং তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।’’ (২) (সূরা আয-যুমার: ৫৪)

الاستعانة (আল-ইস্তে‘আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা:

সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ [الفاتحة: ٥]

অর্থ: ‘‘(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।’’ (সূরা আল-ফাতেহা: ৪)

আর হাদীসে এসেছে,

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

অর্থ: ‘‘যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।’’ (৩)

(১) الخشية (আল-খাশিয়াত) ভয় করা: আল্লাহর পূর্ণ নেতৃত্ব ও মহত্বকে যথাযথ ভয় করা।

(২) الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা: আল্লাহর আনুগত্য করে ও অবাধ্যতার কাজ পরিহার করে তাঁর দিকে ফিরে আসা। যেমন أَنِيبُوٓاْ অর্থাৎ: তোমরা ফিরে আসো। إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ অর্থাৎ: তুমি তোমার সকল কার্যাদিকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ কর। কেননা তুমি একজন বান্দা। আর দাসের করণীয় হলো মালিকের জন্য আত্মসমর্পণ করা। মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা‘আলা। যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: السيد هو الله আল্লাহই মালিক।

(৩) الاستعانة (আল-ইস্তে‘আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থ: ‘‘(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।’’

উক্ত আয়াতে যে অংশটি পরে হওয়ার কথা ছিল তা আগে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এটিই প্রমাণ করছে সীমাবদ্ধতাকে। অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

الاستعاذة (আল-ইস্তে‘আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা:

আশ্রয় চাওয়া ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ [الناس: ١، ٢]

অর্থ: ‘‘বল, আমি মানুষের রব ও মানুষের অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’’ [৪] (সূরা আন-নাসঃ ১,২)

الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা:

উদ্ধার কামনা করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ [الانفال: ٩]

অর্থ: ‘‘আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (কবুল করলেন)।’’[৫] (সূরা আনফালঃ ৯)

الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা:

যবেহ করাও ইবাদত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

অর্থ: ‘‘(হে রাসূল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনোই শরীক নেই; এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী।’’ (সূরা আল-আন‘আমঃ ১৬২-১৬৩)

হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

‘‘যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।’’ [৬]

(৪) الاستعاذة (আল-ইস্তে‘আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা: তা হলো অপছন্দনীয় বস্তু হতে দূরে থাকা। أَعُوذُ অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৫) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা: তা হলো বিপদ ও ধ্বংস হতে মুক্ত করার প্রার্থনা করা।

الاستعاذة – الاستغاثة-الاستعانة – الشفاعة	
বা সুপারিশ, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা ও উদ্ধার প্রার্থনা করা বিষয় গুলো চারটি শর্তসাপেক্ষে সৃষ্টির কাছে চাওয়া জায়েয আছে:	
১. জীবিত হওয়া	২. উপস্থিত থাকা
৩. উক্ত বিষয়ে সক্ষম হওয়া	৪. তাকে শুধু মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা

(৬) الذبح (আয্-যাবহ) যবাই করা: তা হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কোন জন্তু উৎসর্গ করা।

যবেহ তিন প্রকার:

১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা যেমন: হজ্বের সময় কুরবানী করা, ঈদুল আযহাতে কুরবানী ও সাধারণ সাদকা করা।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মানার্থে ও ভালবাসার উদ্দেশ্যে যবেহ করা যেমন জ্বীন ও কবর বাসীদের জন্য যবেহ করা। এটি বড় শিরক।

৩. বৈধ সাধারণ যবেহ করা যেমন গোশত খাওয়া, মেহমানকে সম্মান করা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

* বি:দ্র: যবেহ সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা লেখকের কিতাবুত তাওহীদ নামক গ্রন্থে আসছে ইনশাআল্লাহ।

النذر (আন্-নযর) মানত করা ইত্যাদি:

মানত পূর্ণ করাও ইবাদত

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الانسان: ٧]

অর্থ: ‘‘তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।’’[১] (সূরা আদ-দাহারঃ ৭)

(১) النذر (আন্-নযর) এর পরিচয়:

শাব্দিক পরিচয়: অঙ্গিকার করা বা মানত করা

পারিভাষিক পরিচয়: ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় এমন বিষয়কে নিজের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক করে নেওয়া

* বি:দ্র: নযর বা মান্নতের প্রকার, শর্তসমূহ ও এর কাফফারা সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা লেখকের কিতাবুত তাওহীদ নামক গ্রন্থে আসছে ইনশাআল্লাহ।

النذر (আন্-নযর) এর প্রকারভেদ:

১. আল্লাহর জন্য মানত করা

২. আল্লাত ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা

বিঃদ্রঃ লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যে ইবাদতগুলোর বিবরণ দিয়েছেন তা সীমাবদ্ধতার জন্য নয় বরং উদাহরণস্বরূপ। কেননা আরো অনেক ইবাদত রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়নি। মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি এই ইবাদতগুলো বা অন্য যে কোন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করবে সে অবশ্যই শিরক করবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি:

প্রমাণাদিসহ ইসলাম সম্পর্কে জানা।

আর দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে, তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা।

বস্তুত দ্বীনের রয়েছে তিনটি স্তর :

(ক) ইসলাম

(খ) ঈমান

(গ) ইহসান

আবার প্রত্যেক স্তরের কিছু রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ইসলাম[১]

ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি:

১) আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।[২]

২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা

৩) যাকাত প্রদান করা

৪) রামাযান মাসের সাওম পালন করা

৫) আল্লাহর ঘর হারামে হজ্জ করা

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দ্বিতীয় মূলনীতিটি ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হলো দ্বীন সম্পর্কে বান্দার জ্ঞানার্জন করা। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের পরিচয় দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন:

প্রথম স্তর: ইসলাম

ইসলামের পরিচয়: তাওহীদ বা এককত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য বরণ এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা

আর এটিই হচ্ছে ইসলামের পরিচয় যে, তুমি তোমার সকল কার্যাদিকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করবে। কেননা তুমি একজন দাস আর দাসের করণীয় হলো মালিকের জন্য আত্মসমর্পণ করা। মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা, যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: السيد هو الله - আল্লাহই মালিক।

তার পর লেখক (রহিমাহুল্লাহ) দ্বীনকে তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন:

১. ইসলাম

২. ঈমান

৩. ইহসান

(২) ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি যার প্রথমটি হলো: الشهادة বা সাক্ষ্য প্রদান করা।

প্রথম রুকন বা স্তম্ভ: الشهادة বা সাক্ষ্য প্রদান করা এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

[آل عمران: ١٨]

অর্থ: ‘‘আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং ফিরিশতাবৃন্দ ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও। আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’’ (সূরা আলে-ইমরান:১৮)

এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনি আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইবাদতের ইলাহ নেই।

এর দু’টি দিক রয়েছে একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, لا إله বা কোনই মা‘বুদ নেই, এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে।

আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, إلا الله বা ‘আল্লাহ ব্যতীত, এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না।

এ তাওহীদ বা একত্ববাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতটি স্পষ্ট করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الزخرف: ٢٦، ٢٨]

অর্থ: ‘‘আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১] সম্পর্ক আছে তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এ ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছেন তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা (শিরক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।’’ [২] (সূরা আয্-যুখরুফ: ২৬-২৮)

\# লেখক (রহিমাহুল্লাহ) لا إله إلا الله এর সাক্ষ্য প্রদানের দলীল উল্লেখ করেছেন এবং এর অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

তা হলো, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বুদ নেই।

সাক্ষ্য প্রদানের দু’টি দিক রয়েছে:

১. নেতিবাচক দিক

২. ইতিবাচক দিক

لا إله বা ‘‘সত্য কোনো মা‘বুদ নেই" এটি হচ্ছে নেতিবাচক দিক।

আর إلا الله বা ‘একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত’ এটি হচ্ছে ইতিবাচক দিক।

সুতরাং إلا الله বা ‘একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত’ অংশটি সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচকের অর্থ প্রদান করছে। যেমনভাবে তা ইবাদতকে শুধু এক আল্লাহ তা‘আলার জন্যই সীমাবদ্ধ ও সাব্যস্ত করছে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে তা নাকচ করে দিচ্ছে।

এ জন্য লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যা তার ব্যাখ্যাকে নিম্নের আয়াতটি স্পষ্ট করে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى [الزخرف: ٢٦]

অর্থ: ‘‘আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যেসব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ; সম্পর্ক আছে তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।’’ (সূরা আয্-যুখরুফ: ২৬)

(১) إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ এর অর্থ হচ্ছে لا إله বা সত্য কোনো মা‘বুদ নেই।

(২) إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى অর্থাৎ إلا الله বা ‘‘একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত,।

অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًۭٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [ال عمران: ٦٤]

অর্থ: ‘‘বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বাণীর প্রতি আস যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোনো কিছু তাঁর শরীক গণ্য করব না। আর আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে কস্মিনকালেও রব বলে গ্রহণ করব না, কিন্তু তারা যদি এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও জেনে রেখ, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম।’’ [১] (সূরা আলে-ইমরান: ৬৪)

* কেউ যদি বলে যে, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত মা‘বুদ নেই?

তাহলে আমরা বলবো এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এ কথাটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত মা‘বুদকে সত্যায়ণ করছে। কিন্তু যখন بحق বা সত্য শব্দটি বলবে তখন এটি প্রমাণ করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত যে সব মা‘বুদের ইবাদত করা হয় সে তা অস্বীকার করছে এবং সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বুদ নেই।

* কেউ যদি বলে, لا إله إلا الله এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো প্রতিপালনকারী নেই।

তাহলে আমরা তার উত্তরে বলবো: এটি গ্রহণযোগ্য কথা। কিন্তু সেটি لا إله إلا الله এর ব্যাখ্যা নয় বরং সেটি তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। কেননা রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যেসকল কাফেরদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা এটি স্বীকার করেছিল কিন্তু এটি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাতে পারেনি।

(১) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ - এই আয়াতটি ধর্মসমূহের সমন্বয় বাতিলের উপর প্রমাণ করে।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ সাক্ষ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة: ١٢٨]

অর্থ: ‘‘অবশ্যই তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দুর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলো, যিনি তোমাদের প্রতি সদা সচেতন, মু'মিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও দয়াবান।’’ [১] (সূরা আৎ-তাওবাঃ ১২৮)

আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে,

১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা।

২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা।

৩. তিনি যা থেকে সতর্ক করেন তা বর্জন করা এবং

৪. কেবল তার প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা।[২]

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতটি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদানের দলীলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সাক্ষ্য প্রদানে তিনটি তা'কীদ বা গুরুত্ব ব্যবহার করেছেন-

১. উহ্য কসম বা শপথ

২. لام - লাম হরফের মাধ্যমে তা'কীদ

৩. قد -ক্বদ হরফের মাধ্যমে তা'কীদ

(২) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর এ সাক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দানে মুসলিম প্রত্যেক নর-নারীর উপর আবশ্যক হলো: তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা, তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা ও তিনি যা থেকে নিষেধ ও ধমক দিয়েছেন তা বর্জন করা এবং কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা।

নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর মৌলিক অর্থ হলো: তিনি একজন বান্দা, সুতরাং তাঁর ইবাদত করা যাবে না। তিনি একজন রাসূল, সুতরাং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না।

আর এর ব্যাখ্যা মূলক অর্থ হলো:

- ১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী প্রচারক।
- ২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। কেননা তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সত্যবাদী যাঁকে সত্যবাদী বলা হয়েছে।
- ৩. তিনি যা থেকে নিষেধ ও ধমক দিয়েছেন তা হতে বিরত থাকা এমনভাবে যে, তিনি যা থেকে বারণ করেছেন তা এক পার্শ্বে রাখবে এবং তুমি অন্য পার্শ্বে অবস্থান করবে।
- ৪. কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা। আর এটিই বিদআতীদের প্রতিবাদ করে।

আর সালাত, যাকাতের প্রমাণ এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ [البينة: ٥]

অর্থ: ‘‘তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সলাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।’’ (১) (সূরা আল-বাইয়্যেনাহঃ ৫)

সাওমের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٣]

অর্থ: ‘‘হে মু‘মিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।’’ (২) (সূরা আল-বাকারা, ১৮৩)

হজ্জের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ [آل عمران: ٩٧]

অর্থ: ‘‘আর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা‘বাগৃহের হজ্ব করা ফরয, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (জেনে রাখ) আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।’’ (৩) (সূরা আলে-ইমরান: ৯৭)

(১) দ্বিতীয় স্তম্ভ : সলাত

সলাতের পরিচয়: তা হলো কতক কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যা তাকবীর দিয়ে শুরু হয়ে সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। এটিই দ্বীনের খুঁটি। মহান আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে সরাসরি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মি‘রাজের রজনীতে ফরয করা হয়েছে।

তৃতীয় স্তম্ভ: যাকাত

যাকাতের শাব্দিক পরিচয়: বৃদ্ধি করা ও পবিত্র করা।

ইহা দুই প্রকার:

১. শরীরের যাকাত।

২. মাল বা সম্পদের যাকাত।

(২) চতুর্থ স্তম্ভ: সিয়াম বা রোযা

সিয়ামের শাব্দিক পরিচয়: বিরত থাকা।

পারিভাষিক পরিচয়: সুবেহ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে যাবতীয় রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থেকে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা।

সিয়াম একটি উত্তম ইবাদত, কেননা তাতে ধৈর্য্যের তিনটি বিষয় রয়েছে। ইহার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে সিয়াম পালনকারীকে তার প্রতিদান দিবেন।

(৩) পঞ্চম স্তম্ভ: হাজ্জ

হাজ্জের শাব্দিক পরিচয়: ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।

পারিভাষিক পরিচয়: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পদ্ধতি অনুযায়ী হাজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

এটা সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার আদায় করা ফরয।

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে, ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে, ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা।

তবে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি:

(১) আল্লাহর উপর ঈমান
(২) ফেরেশতাগণের উপর ঈমান
(৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান
(৪) রাসূলগণের উপর ঈমান
(৫) শেষ দিবসের উপর ঈমান
(৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

এ ছয়টি রুকনের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ [البقرة: ١٧٧]

অর্থ: ''তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনোই পুণ্য ও কল্যাণ নেই। বরং পুণ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করে।'' (সূরা আল-বাকারাহ্, ১৭৭)

আর তাকদীর এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ [القمر: ٤٩]

অর্থ: ''নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।'' (সূরা আল-কামার, ৪৯)

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

ঈমানের শাব্দিক পরিচয়: দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া।

পারিভাষিক পরিচয়: মুখে উচ্চারণ করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমলে বাস্তবায়ন করা।

আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্য কাজের কারণে ঈমান হ্রাস পায়।

ঈমানের পারিভাষিক পরিচয়ে পাঁচটি বিষয় থাকা আবশ্যক। যখন পাঁচটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া না যায় তাহলে তখন আহলে সুন্নাহ ও জামা'আতের নিকট তা ঈমানের পরিচয় থেকে বের হয়ে যায়।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রমাণ কী?

উত্তর: রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' মুখে উচ্চারণ করা। এটা মুখে উচ্চারণের দলীল।

আর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের দলীল।

আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে অন্তরের আমলের দলীল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا [التوبة: ١٢٤]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? (সূরা আত-তাওবাহ:১২৪)

এটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় ঈমান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঈমান যখন বৃদ্ধি হয় তা অবশ্যই হ্রাসও পায়। ঈমান কমে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনিবলেছেন: অর্থ: আমি হ্রাস পাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে দেখতে পায় (মানুষের) বিবেক ও ঈমান। সুতরাং দ্বীন হ্রাসই পায়। মহিলাদেরকে বিবেক ও দ্বীনের দিক দিয়ে হ্রাস হতে দেখেছি।

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি:

- (১) আল্লাহর উপর ঈমান
- (২) ফেরেশতাগণের উপর ঈমান
- (৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান
- (৪) রাসূলগণের উপর ঈমান
- (৫) শেষ দিবসের উপর ঈমান
- (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

প্রথম রুকন বা স্তম্ভ: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, এক্ষেত্রে চারটি বিষয় থাকা আবশ্যক:

১. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা। এটি আবার চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে হয়ে থাকে:

২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর প্রতি ঈমান আনা

৩. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ এর প্রতি ঈমান আনা

৪. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর প্রতি ঈমান আনা

ক. বিবেকের মাধ্যমে: সুতরাং অনুধাবন করবে যে, সৃষ্টি কর্তা ব্যতীত সৃষ্টি জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। যেমন আল্লাহর বাণী: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ [الطور: ٣٥] অর্থ: তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (সূরা আল-তুর:৩৫)

খ. অনুভূতির মাধ্যমে: বিপদে তুমি তোমার দু'হাতকে আকাশের দিকে উত্তোলন করবে এবং বলবে: হে আল্লাহ কেবল তুমিই এ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারো। তুমি দেখতে পাও যে, আল্লাহই তোমাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করেন।

গ. ফিতরাতের মাধ্যমে: প্রত্যেকটি সন্তান তার মূল ফিতরাতের (তাওহীদ) উপর জন্ম লাভ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে হয়তো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।

ঘ. শরীয়তের মাধ্যমে :ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত তাওহীদ বা এককত্বের প্রমাণ।

দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা

ফেরেশতাদের পরিচয়: তারা অদৃশ্য সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে কিন্তু তারা কক্ষনো তাঁর অবাধ্য হয় না। তাদের :

ক. রূহ বা আত্মা রয়েছে : روح القدس বা পবিত্র আত্মা।

খ. শরীর রয়েছে : [الفاطر: ١] جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ

অর্থ: ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক, তারা দুই দুই, তিন তিন, চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। (সূরা আল-ফাতির:১)

গ. বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর রয়েছে:[السبا: ٢٣] حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

অর্থ: যখন তাদের অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর করা হবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? (সূরা আল-সাবা:২৩)

আমরা ঈমান আনবো:

ক. তাদের উপর যাদের নাম আমাদেরকে জানানো হয়েছে। (যেমন: জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিল (আলাইহিমুস সালাম)।

খ. তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর। [التحريم: ٦] لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না, এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা করে। (সূরা আত-তাহরীম:৬)

গ. তাদের কার্যাদির উপর। তাদের কার্যসমূহের একটি হলো: আরশ বহন করা।

ঘ. তাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত যেসকল সংবাদ এসেছে তার উপর।

তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ: কিতাবের প্রতি ঈমান আনা

আমাদের উপর একথা বিশ্বাস করা অপরিহার্য যে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবসমূহ আল্লাহর বাণী। সেগুলো অবতীর্ণ বাণী কিন্তু সৃষ্টি নয়। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা উক্ত বিষয়ে এবং যে সমস্ত কিতাবের নাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলোর বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যতক্ষণ পর্যন্ত তা রহিত করা না হয়। আর আমরা একথা বিশ্বাস করবো যে, নিশ্চয় কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানসুখ করে দিয়েছে। যেমন: তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং ইবরাহীম ও মূসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর সহীফাসমূহ।

চতুর্থ রুকন বা স্তম্ভ: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা

আমাদের করণীয় হলো একথা বিশ্বাস করা যে, তাঁরা সকলেই মানব। তাঁদের কোন প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতা নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তাঁদের ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলাই তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের নিকট অহী অবতীর্ণ করেছেন। তাঁদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তাঁরা আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মাতকে নসিহত করেছেন ও তাঁদের নিকট বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে সত্যিকার জিহাদ করেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি ঈমান আনবো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের যে নাম, আকার-আকৃতি ও খবর সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করবো। আদম (আলাইহিস সালাম) প্রথম নাবী। নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম রাসূল। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

শেষ নাবী ও রাসূল । মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত মানসুখ (রহিত) হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন পাঁচজন (নাবী ও রাসূল) যাদের নাম সূরা শূরা ও আহযাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

১. মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
২. নূহ (আলাইহিস সালাম)।
৩. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।
৪. মূসা (আলাইহিস সালাম)।
৫. ঈসা (আলাইহিস সালাম)।

পঞ্চম রুকন বা স্তম্ভ: কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যে সমস্ত খবর দিয়েছেন যা মৃত্যুর পর ঘটবে সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। যেমন: কবরের পরীক্ষা, শিংগায় ফুৎকার দেয়া, কবর হতে মানুষকে উত্তোলন, দাঁড়িপাল্লা স্থাপন, আমলনামা প্রদান,পুলসিরাত, হাওযে কাওছার, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামতের দিন আল্লাহকে মু'মিনদের দর্শন লাভ এবং অদৃশ্যের অন্যান্য বিষয়াবলী।

ষষ্ঠ রুকন বা স্তম্ভ: ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা

ঈমানের এ রুকনটি চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সম্পৃক্ত:

১. العلم- জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন।

২. الكتابة- লিপিবদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি বিষয়ের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৩. المشيئة- ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয় এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। বান্দারও ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন।

৪. الخلق- সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তা হলো: এ কথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় বান্দা ও বান্দার যাবতীয় কার্যাবলীর সবগুলোই সৃষ্ট। অনুরূপভাবে সমস্ত সৃষ্টি। তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الصفات: ٩٦]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-সফফাত:৯৬)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصفات: ٩٦]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আস-সফফাত:৯৬)

তৃতীয় স্তর: ইহসান

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে

“তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যে তুমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে এ কথা মনে করবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।”

ইহসানের প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ [النحل: ١٢٨]

অর্থ: “নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান অবলম্বন করে, আল্লাহ (জ্ঞানে এবং সাহায্য-সহযোগিতায়) তাদের সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা আন্-নাহল, ১২৮)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ٢١٩ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ [الشعراء: ٢١٧، ٢٢٠]

অর্থ: “আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াবানের উপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (রাতে সলাতের জন্য) দাঁড়াও আর যখন তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আশ্-শু‘আরা, ২১৭-২২০)

তদ্রূপ আল্লাহর অপর বাণী,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ [يونس: ٦١]

অর্থ: “এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর না কেন, আর সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন এবং তোমরা যে কোনো কর্ম সম্পাদন কর না কেন আমরা সে সবের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি; যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।" (সূরা ইউনুস, ৬১)

তৃতীয় স্তর: ইহসান

এটি দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। তার এমন একটি স্তম্ভ রয়েছে যার দু'টি স্তর আছে:

১. চাক্ষুষ ইবাদত। তা হলো: আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভালবাসা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ইবাদত করা। যেমন নাবী-রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) ইবাদত। তবে এ স্তরে অন্যদের পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. মুরাকাবার ইবাদত। তা হলো: ভয় ও ভীতির সাথে ইবাদত করা। এ স্তর হতে কোন মুসলিম বের হতে পারবে না । (অর্থাৎ এটি ইবাদতের সর্বনিম্ন স্তর)।

* বিঃদ্রঃ- এটির অর্থ এই নয় যে, এ স্তরের লোকের নিকট শুধু আল্লাহর ভালবাসা রয়েছে, তার কাছে আল্লাহর ভয় নেই। তবে এ স্তরের বান্দারা ইবাদতের জন্য সর্বাধিক মনোযোগী হয়ে থাকে । আর এটিই হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা। যেমন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।

এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিবরীল আলাইহিস্ সালাম -এর এ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস যা ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: ‘‘একবার আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশও ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোনো নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, আর আমাদের কেউ তাকে চিনেও না। অতঃপর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ইসলাম হচ্ছে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের সাওম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরে হজ্জ করা।

আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। এতে আমরা আশ্চর্য হলাম যে, তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন।

অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: (ঈমান হলো) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করা। আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন।

এরপর আগন্তুক বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ একথা মনে করবে, আর যদি এটা সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

অতঃপর আগন্তুক বললেন: ‘‘আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন| নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জানে না।

এরপর আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে জানান। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন,

যখন দাসী স্বীয় মালিকের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্নপদবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী করবে।

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন: আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে উমর, তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে ছিলেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল, তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা প্রদানার্থে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।’’ (বুখারী- হাদীস নং ৫০ মুসলিম- হাদীস নং ৮)

এ হাদীসটি ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের প্রমাণ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির চেয়ে জিজ্ঞাসাকারী কিয়ামতের ব্যাপারে ভাল জানেন। এ উক্তিটি প্রমাণ করে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের সময় সম্পর্কে কেবল আল্লাহই জানেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি: দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে এর অর্থ হলো:

১. অবাধ্যতা বেড়ে যাবে,
২. দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে,
৩. অবস্থার পরিবর্তন হবে,
৪. বাদশা বিবাহ করবে দাসীকে।

তারপর ঐ দাসী ছেলে জন্ম দিবে এবং এ ছেলেটি তার পিতার মৃত্যুর পর বাদশা হবে এবং সে তার মাতার মালিক হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) আপনি দেখতে পাবেন, নগ্নদেহ ও নগ্নপদবিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী করবে।

الحفاة শব্দের অর্থ: নগ্নপদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

يتطاولون في البنيان অর্থাৎ: মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। দরিদ্ররা সীমাতীত ধনাঢ্যতার অধিকারী হবে।

হাদীসে জিবরীল হতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) ছাত্রদের উপর করণীয় হলো ৬টি অধিকার রক্ষা করা:

১. নিজের হক্ব রক্ষা করা ২. শিক্ষকের হক্ব রক্ষা করা ৩. স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হক্ব রক্ষা করা ৪. সহপাঠীদের হক্ব রক্ষা করা ৫. কিতাবের হক্ব রক্ষা করা ৬. অর্জিত বিদ্যার হক্ব রক্ষা করা।

১. নিজের হক্ব রক্ষা করা:

জ্ঞানার্জন করা একটি ইবাদত (সুতরাং এক্ষেত্রেও নিয়তকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণ করা আবশ্যক)। তুমি আত্ম-প্রচেষ্টা, ভয়, সম্পর্ক স্থাপন, বিনয় নম্রতা ও অহংকার পরিহারে সালাফী (পূর্বসূরীদের অনুসারী) হয়ে যাও।

ছাত্রের আরো করণীয় হলো: অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ও ইবাদতে মনোযোগী হওয়া, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়া, মহত্ব অর্জন করা, সাহসীদের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া, বিলাসিতা পরিত্যাগ করা, খেল-তামাশা হতে দূরে থাকা, দয়শীল হওয়া, ও প্রমাণাদীসহ সত্যের উপর অবিচল থাকা।

ছাত্রের আরো করণীয় হলো: জ্ঞান অন্বেষণে দৃঢ় বিশ্বাসী ও আশাবাদী হওয়া। জ্ঞান অন্বেষণের শর্ত হলো: ভ্রমণ করা, ভালভাবে মুখস্থ করা, মুখস্থ বিদ্যা যত্নসহকারে ধরে রাখা।

মূলনীতির উপর বিভিন্ন বিষয়ে তাখরীজ (শুদ্ধতা যাচাই) করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা,আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা, ইলমি আমানত ঠিক রাখা ও সত্য বলা।

অজানা বিষয়ে 'আমি জানি না' একথা বলা, এটি হচ্ছে ছাত্রের ঢাল, সময়ের সৎ ব্যবহার করাই হলো মূলধন সংরক্ষণ করা, বিভিন্ন লোভ-লালসা হতে আত্মাকে ধরে রাখাই হলো মূল শিক্ষার পরিচয়।

আদবের সাথে প্রশ্ন করার পর মনোযোগসহকারে উত্তর শ্রবণ করা, তারপর উপলব্ধি করা অতঃপর আমলে বাস্তবায়ন করা, কাউকে হারিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মুনাযারা (বিতর্ক) না করা, বিদ্যা চর্চা করা। কুরআন, হাদীস এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণা করা, প্রত্যেকটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানা।

বেশি বেশি আমল করা এবং নেতৃত্ব, প্রসিদ্ধিতা ও দুনিয়া পাওয়ার আশা না করা, নিজের ক্ষেত্রে কু-ধারণা করা এবং অন্যের ক্ষেত্রে সু-ধারণা করা।

জ্ঞানের যাকাত হচ্ছে: সত্যকে আঁকড়ে ধরা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা, জ্ঞানের প্রচার করা, মানুষের উপকারে অনুরাগী হওয়া, পরিশ্রম করা, ভাল কাজে মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করা।

মর্যাদাবান হওয়া, বিদ্যা পরিচর্যা করা, সৎ চরিত্রবান হওয়া ও অসৎ চরিত্র পরিহার করা, কোমল আচরণের অধিকারী হওয়া, চাটুকার না হওয়া, প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যার্জন ও পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বে নিজেকে আত্ম-প্রকাশ করা হতে বিরত থাকা। আলেম-উলামাদের মতানৈক্য ও সন্দেহমূলক বিষয় পরিহার করা। দলগত, জাতিগত সমস্ত সংশয়কে প্রতিরোধ করা।

২. শিক্ষকের হক্ব রক্ষা করা:

এক্ষেত্রে জনগণ দু' ভাগে বিভক্ত:

ক. কিছু লোক দু' প্রান্তবর্তী।

খ. কিছু লোক মধ্যম পন্থী।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক চালু হয়েছিল সৎ বান্দাদের ব্যাপারে সন্দেহমূলক বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের করণীয় হলো সৎ বান্দাদের ব্যাপারে মধ্যম পন্থী হওয়া, তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা। এ ব্যাপাটি পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

৩. স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হক্ব রক্ষা করা।

৪. সহপাঠীদের হক্ব রক্ষা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: ١١٠]

অর্থ: তোমরাই হচ্ছো উত্তম জাতি যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অন্য ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৫. কিতাবের হক্ব রক্ষা করা:

তা হলো কিতাব সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে নি'য়ামত দান করেছেন, সুতরাং কিতাবকে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

৬. অর্জিত বিদ্যার হক্ব রক্ষা করা:

তা হলো ইলমকে ধরে রাখা এবং সর্বদায় তা পাঠ করা ও উক্ত ইলম অনুযায়ী আমল করা। অতঃপর মানুষকে তার দিকে দাওয়াত দেয়া। কেননা এটা নি'য়ামত, আর নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এটি একটি বড় নি'য়ামত। সুতরাং এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

(২) প্রশ্ন করার আদব হচ্ছে, এমন প্রশ্ন করা যেসকল প্রশ্নে উপকার ও ফায়েদা রয়েছে ।

(৩) ছাত্রের কর্তব্য হলো তার উত্তম চরিত্রের উপর অবিচল থাকা।

(৪) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পরে " الله و رسوله أعلم " বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন, এ কথা বলা যাবে না বরং শুধু বলতে হবে: "الله أعلم" বা আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয় মূলনীতি: নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা

তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালেব ইবনে হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশ থেকে আর কুরাইশ হলো আরব গোষ্ঠী । এ গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের বংশধর (আলাইহিমুস সালাম)।

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্ম লাভ করেন। তিনি তেষট্টি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং ‘‘নাবী ও রাসূল’’ হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)।

তাকে সূরা ‘‘ইকরা’’ নাযিল করার মাধ্যমে নাবী এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি (জন্ম লাভ করেন) মাক্কাতে তার পর হিজরত করেন মাদীনাতে।

এ অনুচ্ছেদটিতে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কিত বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম,বংশ পরিচয়, বয়স এবং তাঁর দাওয়াত প্রচার সম্পর্কে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক

১. নাম ও বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালেব ইবনে হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশ থেকে এবং এটি আরব কওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের (আলাইহিমুস সালাম) বংশধর।

২. বয়স: তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোট বয়স ছিল ৬৩ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব জীবন এবং ২৩ বছর নবুওয়াতী জীবন।

তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতী জীবন দু’ ভাগে বিভক্ত:

১. মাক্কী জীবন ১৩ বছর

২. মাদানী জীবন ১০ বছর

প্রশ্ন: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবী নাকি রাসূল ছিলেন?

উত্তর: তিনি নাবী ও রাসূল উভয়টি ছিলেন। সূরা ইকরা নাযিল করার মাধ্যমে 'নাবী' এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে 'রাসূল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী:

মাক্কী জীবনে দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ সংক্রান্ত। আর তা হলো শিরককে বর্জন করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা। এই দাওয়াতের সময় ছিল ১০ বছর।

অতঃপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাদীনায় হিজরত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানেও দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ। তবে সেখানে দ্বীনের অবশিষ্ট ইবাদত সমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব জীবন যাপনের বিভিন্ন নিয়মাবলী দাওয়াতের সাথে সংযুক্ত হয়।

সুতরাং তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতী জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ দাওয়াত ছিল তাওহীদের উপর। আর এটিই ঐ সকল লোকদের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে যারা মানুষকে তাওহীদ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে অনুৎসাহিত করে এবং দাবি করে যে, তাওহীদ শিক্ষার্জন করতে হয় শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে (মি'রাজের রজনীতে) আকাশে উঠানো হয়েছিল। একথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে-

১. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্যের যেসব সংবাদ দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো:- আমরা ঈমান আনলাম, সত্য বলে স্বীকার করলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম।

২. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের গুরুত্ব, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা তা আকাশে ফরজ করেছেন।

শিরক থেকে সতর্ক করার জন্য এবং তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করেন।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ ٧ [المدثر: ١، ٧]

অর্থ: "হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী! উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রবের মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভুর(আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর।" (সূরা আল- মুদ্দাসসিরঃ ১-৭)

এখানে

قُمۡ فَأَنذِرۡ [المدثر: ٢]

অর্থ: "উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর।" (সূরা আল মুদ্দাসসির:২)

এর অর্থ, শিরক হতে সতর্ক করবে এবং তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাবে।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ [المدثر: ٣]

অর্থ:"আর তোমার রবের মহিমা ঘোষণা কর।" (সূরা আল মুদ্দাসসির:৩)

এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার কর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ [المدثر: ٤]

অর্থ: "আর তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ।"(সূরা আল মুদ্দাসসির:৪)

এর অর্থ "আমলসমূহ'কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ।

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ [المدثر: ٥]

অর্থ: "আর কদর্যতা বর্জন কর।"(সূরা আল মুদ্দাসসির:৩)

এর মধ্যে রুজয, এর অর্থ প্রতিমা আর 'হাজর' এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুতরাং আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, প্রতিমা পূজা ও পূজকদের ত্যাগ করা, প্রতিমা থেকে সম্পর্কচ্যুতি এবং পূজকদের সাথে সম্পর্ক করা থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করা।

তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশ বছর ধরে এ তাওহীদের দিকেই মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর তাকে আসমানে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতঃপর মক্কা ভূমিতে তিন বছর উক্ত সালাত সম্পাদনের পর আল-মদীনায় হিজরত করার আদেশপ্রাপ্ত হন।

হিজরতের পরিচয়:

হিজরতের অর্থ: শিরক-কলুষিত দেশ পরিত্যাগ করে ইসলামী দেশে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীয়া) জন্য শিরক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয। এ হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকবে।

এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾
فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: ٩٧، ٩٩]

অর্থ: ‘‘নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের জান (রূহ) কবয করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কী অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় অবস্থায়। ফিরিশতাকুল বলবেন: আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে সেইসব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল। কিন্তু যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হয় না, এমন কি পথ সম্পর্কেও তারা কোনো সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী।’’ (সূরা আন-নিসা, ৯৭-৯৯)

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ [العنكبوت: ٥٦]

অর্থ: ‘‘হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার জমিন প্রশস্ত। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক|’’ (সূরা আল-আনকাবূত, ৫৬)

ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘‘এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যেসব মুসলিম হিজরত না করে মাক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের ঈমানের সম্বোধন করে আহ্বান করেছেন।''

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

অর্থ: ‘‘তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।’’ (*)

হিজরত তিন প্রকার:

১. কুফরি দেশ ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে হিজরত করা। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক।

২. মাক্কা হতে মাদীনাতে হিজরত করা। এটি মাক্কা বিজয়ের পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

৩. মহান আল্লাহ তা'আলা যা পরিহার করতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকা। হোক তা যেকোন আমল বা আমলকারী অথবা কোন স্থান বা সময়। যেমন শিরক করা ও মুনাফিক বা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা ইত্যাদি। #

এখানে ‘আমল’ বলতে: আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন তা হতে বিরত থাকা। সবচেয়ে বড় নিষিদ্ধ হলো শিরক।

‘আমলকারী’ বলতে: কাফের,মুনাফিক ও অন্যান্যদেরকে বুঝানো হয়েছে।

‘সময়’ বলতে: কাফেরেরা যে সকল সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে তা পরিত্যাগ করা।

‘স্থান’ বলতে: কাফেরেরা যেসকল স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে তা পরিহার করা।

* দু'টি জিনিসের যেকোন একটির মাধ্যমে তাওবা বন্ধ হয়ে যাবে:

১. পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হলে।

২. মৃত্যু হলে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ
إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
[النساء: ١٨]

অর্থ: আর এমন লোকদের ক্ষমা নেই যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মারা যায়।(সূরা আল-নিসা:১৮)

* রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই।

অর্থাৎ এটি শুধু মাক্কা হতে মাদীনাতে হিজরত করা নিষেধ। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর এই উক্তি ইঙ্গিত বহন করছে যে, মাক্কাতে আর কুফরী প্রবেশ করতে পারবে না।

অতঃপর যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় অবস্থান স্থির করেন তখন ইসলামের অন্যান্য শরীয়তভিত্তিক আদেশগুলো প্রাপ্ত হন। যথা যাকাত,[১] সাওম, হজ্জ, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি মারা যান (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক)।[২]

তাঁর প্রচারিত দ্বীন বিদ্যমান আছে, আর এই হচ্ছে তাঁর দ্বীন। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎ কর্ম সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর কল্যাণের পথ সেটি যে পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে: তাওহীদ বা এককত্ব ও ঐ সকল আমল যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। পক্ষান্তরে অকল্যাণের পথ সেটি যা হতে তিনি সতর্ক করেছেন। তা হচ্ছে: শিরক ও আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ অপছন্দ ও ঘৃণা করেন।[৩]

(১) শাইখ ইবনে উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যাকাত প্রথমে মাক্কাতে ফরয হয় কিন্তু সেখানে সম্পদের নিসাব (পরিমাণ) নির্ধারণ করা হয়নি এবং কী পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করা হয়নি। মাদীনাতে হিজরতের পর সম্পদের নিসাব নির্ধারণ করা হয় এবং কী পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করা হয়।

(২) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশম হিজরীতে মারা যান এবং তাঁকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গৃহে দাফন দেয়া হয়।

(৩) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে যে সমস্ত কাজ করার নির্দেশ করেছেন তাতেই কল্যাণ নিহিত এবং যা থেকে বারণ করেছেন তাতেই অকল্যাণ রয়েছে। এ বিষয়টি আবশ্যক করে আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে যে, নিশ্চয় তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমানতকে পূর্ণভাবে আদায় করেছেন, রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, উম্মাতকে সৎ উপদেশ দিয়েছেন ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট দলীলের উপর রেখে গেছেন যার রজনীই হলো দিবালোকের ন্যায়। সুতরাং ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পথভ্রষ্ট হয় না।

বড় পাপসমূহ

১. বড় শিরক (এটা দ্বীন থেকে বের করে দেয়)।

২. ছোট শিরক (এটা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না)।

৩. কাবিরা গুনাহ (যার প্রত্যেকটি পাপের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে)।

৪. সগীরা গুনাহ (যে পাপের জন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই)।

আল্লাহ নাবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সকল জ্বিন ও মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: ١٥٨]

অর্থ: ‘‘বল (হে নাবী) হে মানুষ, আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।"(১) (সূরা আল-আ’রাফ, ১৫৮)

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর মাধ্যমে তাঁর এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ [المائدة: ٣]

অর্থ: ‘‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নে‘আমতকে সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।’’ (২) (সূরা আল-মায়েদা, ৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মারা গেছেন তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ [الزمر: ٣٠، ٣١]

অর্থ: ‘‘(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরকেও মরতে হবে। তারপর তোমরা সকলে তোমাদের রবের নিকটে বিবাদ বিসম্বাদ করবে।’’ (সূরা আয্-যুমারঃ ৩১-৩২)

(১) রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য নাবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে পূর্বের শরীয়তের সকল বিধান মানসুখ করা হয়েছে। সুতরাং রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানার এবং বর্তমান সময়ের ইয়াহুদ ও নাসারাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছার পরেও যদি তারা ইসলামে প্রবেশ না করে তাহলে তারা কাফের যদিও তারা মূসা বা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অনুসারী হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে কুরআন হতে প্রমাণ:

১.

﴿٦٣﴾ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا [آل عمران: ٦٤]

অর্থ: তুমি বল: হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করব না। (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)

২.

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ [التوبة: ٢٩]

অর্থ: তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সকল আহলে কিতাবের লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম। (সূরা আত-তাওবা:২৯)

৩. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আমার কথা শোনার পরেও যদি আমার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে তারা জাহান্নামী।

(২) এ আয়াতটি বিদ‘আতীদের প্রত্যাখ্যান করছে।

আর মানুষ যখন মারা যাবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থিত করা হবে।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ [طه: ٥٥]

অর্থ: ‘‘আমরা তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর তার মধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তা থেকেই একদিন আবার তোমাদেরকে বের করে আনব।’’ (সূরা ত্বা-হা, ৫৫)

আল্লাহর অপর বাণী,

وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا [نوح: ١٧، ١٨]

অর্থ: ‘‘আল্লাহ তোমাদের জমিন হতে উদ্ভুত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি তোমাদেরকে আবার তাতে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং (এর মধ্য থেকে) বের করবেন যথাযথভাবে।’’ (সূরা নূহ, ১৭-১৮)

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) থেকে তার কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-নিকেশ নেয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى [النجم: ٣١]

অর্থ: ‘‘আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই। যাতে তিনি দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের কর্মানুসারে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করেন, পক্ষান্তরে যারা ইহসান (যথাযথভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন) করেছে তাদেরকে পুণ্যফল দিবেন জান্নাতের মাধ্যমে।’’[১] (সূরা আন্-নাজম, ৩১)

আর যারা পুনরুত্থান দিবসে মিথ্যারোপ করে, তারা কাফির।

এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী,

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ [التغابن: ٧]

অর্থ: ‘‘কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের উত্থিত করা হবে, অতঃপর তোমাদের জানানো হবে, আর আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ।’’[২] (সূরা আত-তাগাবুন: ৭)

আল্লাহ তা‘আলা সব নাবীদের প্রেরণ করেছেন জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার জন্য।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ [النساء: ١٦٥]

অর্থ: ‘‘এই রাসূলগণকে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকুলের পক্ষে কৈফিয়ত দেয়ার মতো কিছুই না থাকে।’’ (সূরা আন-নিসা, ১৬৫)

রাসূলদের মধ্যে নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারাই নাবী-রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।

নূহ (আলাইহিস্ সালাম) সর্বপ্রথম রাসূল।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ [النساء: ١٦٣]

অর্থ: ‘‘নিশ্চয়ই আমরা ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের প্রতি।’’[৩] (সূরা আন-নিসাঃ ১৬৩)

(১) সকল মানুষকে মরতে হবে। কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না। সকলের কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান ঘটবে। সেখানে প্রত্যেকের হিসাব নেয়া হবে এবং আমল পরিমাপ করা হবে।

(২) যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে ও হিসাব দিবসকে অস্বীকার করবে সে কুফরী করবে। কেননা সে ঈমানের একটি রুকন অস্বীকার করল।

(৩) নূহ (আলাইহিস সালাম) প্রথম রাসূল।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ [النساء: ١٦٣]

অর্থ: "আমি তোমার নিকট অহী করেছি যেমনভাবে নূহ ও তার পরবর্তীদের নিকট অহী করেছিলাম।" (সূরা আন-নিসা: ১৬৩)

প্রথম নাবী আদম (আলাইহিস সালাম)।
এর প্রমাণ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- তিনি কি নাবী? তিনি বললেন: হ্যাঁ তিনি নাবী।

আর শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ [الأحزاب: ٤٠]

অর্থ: "মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) তোমাদের কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী।" (সূরা আল-আহযাব:৪০)

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর নিজেকে নাবী বা রাসূল দাবি করবে সে কাফের ও মিথ্যাবাদী এবং যারা ঐ ব্যক্তিটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দাদের উপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা ফরয করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: তাগুত হলো, বান্দা যার মাধ্যমে ইবাদত বা আনুগত্য অথবা অনুসরণের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে।

নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত যত জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতদের নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগুতের পূজা থেকে বিরত থাকতে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل: ٣٦]

অর্থ: ''আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে পরিহার কর।'' (সূরা আন-নাহাল ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের উপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে দিয়েছেন।

বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) ইবলিস শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত

(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়

(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞানের দাবী করে

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٥٦]

অর্থ: ''দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি ''তাগুতকে'' অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'' (সূরা আল-বাকারাহ, ২৫৬)

আর এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য।

আর হাদীসে এসেছে,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

অর্থ:''দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত, আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।"

আল্লাহ তা'আলা নাবী ও রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদের দাওয়াতের আহ্বানকারী ও তাগুত এবং শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ছিলেন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ۖ অর্থ: ''আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি।''

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ অর্থ: যেন তোমরা আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা কর। وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ অর্থ: এবং সকল প্রকার তাগুতকে পরিহার কর।

অর্থাৎ- তোমরা তাগুতকে এক পার্শ্বে রেখে দাও এবং তোমরা অবস্থান কর অন্য পার্শ্বে । আর এটিই হচ্ছে তাদের থেকে দূরে থাকার স্পষ্ট বাণী। এটাই হচ্ছে শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকার মূল বা বাস্তব কথা।
আল্লাহ তা'আলা সকল বান্দার উপর ফরয করেছেন তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। সুতরাং ঈমান আনার পূর্বেই তাগুতকে অস্বীকার করা আবশ্যক।
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ [البقرة: ٢٥٦]

অর্থ: ''সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'' (সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬)

তাগুত এর পরিচয়: 'তাগুত' বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; (যেমন: গাছ ও পাথরের ইবাদত করা) বা অনুসরণের ক্ষেত্রে (যেমন: অন্যায় কাজে আলেমদের অনুসরণ করা) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে (যেমন: আল্লাহর অবাধ্য নেতাদের আনুগত্য করা)

বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) ইবলিস শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)।
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত।
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়।
(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবি করে।
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে।

কুরআনের বিধি-বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করার হুকুম

১. বড় কুফরী

যখন কেউ বিশ্বাস করবে যে, মানব রচিত বিধান আল্লাহর বিধানের সমতুল্য বা তার চেয়ে উত্তম তখন এটি বড় কুফরী হবে।

২. ছোট কুফরী

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কুরআনের বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য কিন্তু সে নিজেই খেল-তামাশা বা নেতৃত্বের লোভে বা অন্য কোন কারণে বিচার ফয়সালা করে, তাহলে সে ছোট কুফরী করল।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) জিহাদকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন

১. আত্মার সাথে যুদ্ধ করা। আর তা জ্ঞানার্জন, আমল, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও ধৈর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

২. শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা। তা সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী (শিরক ও বিদআত) পরিহার করার মাধ্যমে ও মনোবৃত্তির অনুসরণকে (কাবিরা গুনাহ ও সাগীরা গুনাহ) পরিহার করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৩. কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা। তা হলো অন্তরে ঘৃণা (পরিকল্পনা), কথা এবং জান ও মালের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৪. জুলুম, বিদআত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তা হলো হস্ত, কথা ও অন্তরে ঘৃণার (পরিকল্পনার) মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উপসংহার:

প্রত্যেক বোধসম্পন্ন ব্যক্তির করণীয় হলো এ মহৎ মতনটি (মূল পাঠ) নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং ভালভাবে গুরুত্ব দেয়া। কেননা এতে এমন কিছু মহা মূল্যবান মূলনীতিসমূহ রয়েছে যার প্রয়োজনবোধ প্রত্যেক মানুষই করবেই।

আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয়ন করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?	চারটি মাসআলা ও তার প্রমাণসমূহ (সূরা আছর)	ইলম বা দ্বীনী জ্ঞানার্জন	আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।
		উক্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল	ইলম আমলকে আহ্বান করে, যদি সাড়া না দেয়, তাহলে তা চলে যায়। যে আলেম ইলম অনুপাতে আলম করে না তাকে মূর্তিপূজকদের পূর্বে শাস্তি দেয়া হবে।
		তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান	দাওয়াতের শর্তসমূহ: ১. দাওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে ২. দাওয়াতের ভিত্তি হবে শারয়ী ইলমের উপর ৩. হেকমত ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দেয়া ৪. আহ্বানকৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া।
			সর্বপ্রথম দাওয়াত দিতে হবে তাওহীদের । কেননা এটি নাবী ও রাসূলদের দাওয়াত। আর দাওয়াতের সর্বোচ্চ স্তর হলো তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া ও শিরক থেকে বাধা প্রদান করা।
		এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ	আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে, আল্লাহর অবাধ্য কাজ পরিহারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা। যেমন: সলাত আদায়, সুদকে পরিহার করা ও দারিদ্রতা।
			অর্থাৎ বিদ্যার্জন, আমলের বাস্তবায়ন ও দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা।
	তিনটি মাসআলা:	তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (রুবুবিয়্যাহর এককত্ব ঘোষণাকারীর উপর উলূহিয়্যাহর ক্ষেত্রেও এককত্ব ঘোষণা করা আবশ্যক) এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রেও।	
		তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (একনিষ্ঠ): ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না- তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।	
		শিরক ও মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা: ১. অন্তরের মাধ্যমে: তা হচ্ছে কাফেরকে ঘৃণা করা, ২. জিহ্বার মাধ্যমে: إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ [الزخرف: ٢٦] অর্থ: তোমরা যার ইবাদত কর আমি তা হতে মুক্ত। (সূরা আল-যুখরুফ: ২৬) ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে:তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিনোদনে না যাওয়া অথবা তাদের পোশাকের সদৃশ্ পোশাক পরিধান না করা এবং তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হওয়া।	

তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয়ন করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?	তাওহীদ অধ্যয়নের কারণ	(الحنيفية) শিরক হতে বিমুখ হয়ে ইখলাস, তাওহীদ ও ঈমানের দিকে ধাবিত সম্প্রদায়।
		শাব্দিক অর্থ: توحيد শব্দটি وحد - يوحد এর মাসদার বা মূল উৎস । যখন কোন বিষয়কে একক করে তখন বলা হয়, وحد الشيئ সে তাকে একক করেছে। পারিভাষিক অর্থ: প্রতিপালন, ইবাদত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা।
		তাওহীদ তিন প্রকার: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ: আল্লাহর সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহ তা'আলা যেসমস্ত নাম বা গুণাবলী নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর এককত্ব ঘোষণা করা। আর তা হচ্ছে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং যা দূরীভূত করেছেন তা কোন ধরণের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।
		শিরক: আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা। আর এটিই সবচেয়ে বড় পাপ।
	তিনটি মূলনীতি	মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচয়: তোমার প্রতিপালক কে? কিভাবে তুমি আল্লাহকে চিনেছ? প্রতিপালকই হচ্ছেন ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, ইবাদতের প্রকারসমূহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের যেকোন ইবাদত করবে দলীলসহ তার হুকুম।
		প্রমাণসহ দ্বীন ইসলামকে জানা, ইসলামের পরিচয়, দ্বীনের স্তরসমূহ, ইসলামের রুকন সমূহ, শাহাদাতের পরিচয়, ঈমানের পরিচয়, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, ইহসান, দ্বীনের স্তর সমূহের দলীল, কিয়ামতের আলামত।
		রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিচয়:তাঁর বংশ, জন্ম, বয়স, নবুওয়াত ও রিসালাত এবং জন্মভূমি সম্পর্কে জানা। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাওহীদের দাওয়াতের সময়সীমা, ইসরা ও মি'রাজ, সলাত কখন ও কোথায় ফরজ হয়? হিজরত ও তার সময় এবং হুকুম, শরীয়তের অবশিষ্ট বিধান গুলো কখন চালু হয়? দাওয়াতের সময়সীমা, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু, তিনি দ্বীনের যে বিধানগুলো নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাঁকে মানব ও দানব সকলের জন্য প্রেরণ, দ্বীনের ও নিয়ামতের পূর্ণতা।

<table>
<tr><td rowspan="12">তিনটি মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জি (কবরের প্রশ্নসমূহ), আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? আমরা কেন তিনটি মূলনীতি অধ্যয়ন করবো? তিনটি মূলনীতি অধ্যয়নে কী উপকারিতা রয়েছে?</td><td rowspan="12">পরিশিষ্ট:</td><td colspan="4">মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আমলের হিসাব, যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফের, রাসূলগণের দায়িত্ব ও তাদের দাওয়াত, প্রথম ও শেষ রাসূল, তাওহীদের দুইটি রুকন: তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাগুতের পরিচয়, তাগুতের উল্লেখযোগ্য প্রকারসমূহ, তাগুতকে অস্বীকার করার পদ্ধতি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, ইসলাম হলো মূল ধর্ম, সলাত দ্বীনের স্তম্ভ, দ্বীনের শীর্ষবিন্দু রয়েছে জিহাদে।</td></tr>
<tr><td rowspan="8">জিহাদের প্রকারসমূহ</td><td>১. আত্মার সাথে যুদ্ধ করা।</td><td colspan="2">আর তা জ্ঞানার্জন, আমল, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও ধৈর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">২. শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা।</td><td rowspan="2">মনোবৃত্তির অনুসরণ করা</td><td>কাবিরা গুনাহ (যার প্রত্যেকটি পাপের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে)।</td></tr>
<tr><td>সগীরা গুনাহ (যে পাপের জন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই)।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী</td><td>বড় শিরক (তা দ্বীন থেকে বের করে দেয়), ছোট শিরক।</td></tr>
<tr><td>বিদআত।</td></tr>
<tr><td>৩. কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা।</td><td colspan="2">তা হলো অন্তরে ঘৃণা- পরিকল্পনা, কথা, জান ও মালের মাধ্যমে হয়ে থাকে।</td></tr>
<tr><td>৪. শিরক, বিদআত ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।</td><td colspan="2">তা হলো হস্ত, কথা ও অন্তরে ঘৃণা- পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়ে থাকে।</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>তাগুত এর পরিচয়</td><td colspan="3">‘তাগুত’ বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; (যেমন: গাছ ও পাথরের ইবাদত করা) বা অনুসরণের ক্ষেত্রে (যেমন: অন্যায় কাজে আলেমদের অনুসরণ করা) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে (যেমন: আল্লাহর অবাধ্য নেতাদের আনুগত্য করা)
বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:
(১) শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়
(৪) যে ব্যক্তি তার নিকট গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে।</td></tr>
<tr><td colspan="4">আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।</td></tr>
</table>

তিনটি মূলনীতির পরীক্ষা

* বন্ধনী থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর:

১. তিনটি মূলনীতির লেখক:
(মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত তামীমি/ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব/ উভয়ে)

২. তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় কবরের প্রশ্নসমূহ:
(সঠিক/ ভুল)

৩. লেখক তিনটি মূলনীতিতে পাঠকের জন্য দু'আ করেছেন:
(দু'টি স্থানে/ তিনটি স্থানে)

৪. লেখকের বইসমূহ বৈশিষ্ট মন্ডিত হয়েছে:
(সহজ ভাষ্য/ সংক্ষিপ্ত তার পর বিস্তারিত/ কুরআন-সুন্নাহ হতে প্রমাণাদি/ ছাত্রের জন্য দু'আ/ সমসাময়িক সন্দেহ পোষণকারীদের প্রত্যাখ্যান/ ব্যাপক ব্যাখ্যা/ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের বিবরণ/উক্ত কিতাবগুলোকে মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলা গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন/ সবগুলোই)

৫. তিনটি মূলনীতির মতটি:
(৫/৬) প্রকার।

৬. তাওহীদ অধ্যয়ন করা:
(ফরযে কেফায়াহ/ ফরযে আইন)

৭. চারটি মাসআলার দলীল:
(সূরা ইখলাস/ সূরা আছর)

৮. যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করল না তার সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে/ উভয়ের সাথে)

৯. ধৈর্য:
(দুই প্রকার/ তিন প্রকার)

১০. সূরা আছরের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর উক্তির অর্থ:
(দলীল বা প্রমাণ সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট/ অন্য সূরাগুলো হতে যথেষ্ট)

১১. যে ব্যক্তি তিন প্রকার তাওহীদের যে কোন একটির প্রতি বিশ্বাস করে, তাহলে সে এককত্ব ঘোষণাকারী নয়:
(সঠিক/ভুল)

১২. শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা যায়:
(অন্তর, কথা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে/ শিরক ও শিরককারী হতে মুক্ত থাকার মাধ্যমে/ উভয়টি)

১৩. আল্লাহর বাণীতে: و أن المساجد لله এর المساجد দ্বারা কী উদ্দেশ্য:
(নির্মিত মাসজিদসমূহ/ সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ/ যে স্থানে সিজদা করা হয়/ সবগুলো)

১৪. সালাফদের দাওয়াতের পদ্ধতি:
(সর্বপ্রথম প্রমাণ তারপর বিশ্বাস/ সর্বপ্রথম বিশ্বাস তারপর প্রমাণ)

১৫. আলেমদের মধ্যে থেকে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে)

১৬. যে সকল বান্দারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সাদৃশ্য:
(ইয়াহুদীদের সাথে/ নাসারাদের সাথে)

১৭. তিনটি মাসআলা বলতে তিনটি মূলনীতিকে বুঝায়:
(সঠিক/ভুল)

১৮. দু'আর প্রকারভেদ:
(ইবাদতের মাধ্যমে দু'আ করা/ চাওয়ার দু'আ/ অবস্থার ও কথার মাধ্যমে দু'আ করা)

১৯. চাওয়ার দু'আ :
(দু' প্রকার/ চার প্রকার)

২০. বিশ্বাসের দিক থেকে মাধ্যম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার:
(দুই প্রান্ত ও মধ্যম পন্থী/ বড় শিরক ও ছোট শিরকও বৈধ)

২১. সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয:
(সকল ক্ষেত্রে / যে ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা রাখে/ চারটি শর্ত সাপেক্ষে যে ক্ষেত্রে সে ক্ষমতা রাখে)

২২. لا إله إلا الله এর অর্থ:
(আবিস্কার করতে সক্ষম/ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই/ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই/ সবগুলো)
২৩. সকল ধর্মকে সমপর্যায় করা:
(জায়েয/ কাবিরা গুনাহ/ কুফরী)
২৪. সামষ্টিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলীল:
(অনেকগুলো/ চারটি)
২৫. ফেরেশতাদের কি অন্তর রয়েছে?
(হ্যাঁ/না)
২৬. ঈমানের সাথে তাওহীদের সম্পর্ক হচ্ছে যে, ঈমান শব্দটি আ'ম বা ব্যাপক এবং তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা:
(সঠিক/ভুল)
২৭. ঈমানের রুকন:
(৫টি/৬টি/৮টি)
২৮. মুশরিকদের ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে:
(সঠিক/ভুল)
২৯. আল্লাহ ব্যতীত যাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করা হয় সে :
(তাগুত/ তাগুত নয়)
৩০. বিশ্ব পরিচালনা ও বৃষ্টি দানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক ঘোষণা করা এটি তাওহীদ:
(উলূহিয়্যাহ/ রুবুবিয়্যাহ/ আসমা ওয়াস সিফাত)
৩১. তাওহীদের বিপরীত:
(বড় শিরক/ ছোট শিরক/ বিদআত)
৩২. পিতা-মাতার সেবা করা সর্বাধিক ওয়াজিব কাজ:
(সঠিক/ভুল)
৩৩. সবচেয়ে বড় পাপ ব্যভিচার করা ও কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা:
(সঠিক/ভুল)
৩৪. মাক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করাকে মি'রাজ বলে:
(সঠিক/ভুল)
৩৫. রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করা হয়েছিল:
(শুধু তার কওমের জন্য/ মানব ও জ্বীন জাতির জন্য)
৩৬. নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম):
(মারা গেছেন/ নাবীরা মরেন না)
৩৭. যে ব্যক্তি পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করবে সে কুফরী করবে:
(বড় কুফরী/ ছোট কুফরী)
৩৮. নাবীদের ধর্ম:
(এক ধর্ম / প্রত্যেক নাবীর স্বতন্ত্র ধর্ম)
৩৯. হিজরত করা:
(মাক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেছে/ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে)
৪০. হিজরত বলতে বুঝায়:
(কুফরীর দেশ ত্যাগ করে ইসলামী রাজত্বে স্থানান্তরিত হওয়া/ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা পরিহার করা)
৪১. ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তবে সৎ ব্যক্তিদের স্বপ্ন অবশিষ্ট রয়েছে:
(সঠিক/ভুল)
৪২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত সম্পাদন করা শিরক:
(বড়/ছোট)
৪৩. কর্তা ও কর্মের বিধান ফয়সালা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে:
(সঠিক/ভুল)
৪৪. প্রথম নাবী:
(নূহ (আলাইহিস সালাম) / আদম (আলাইহিস সালাম))
৪৫. আমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি:
(নাবী/ রাসূল/ উভয়টি)

প্রথম সারির শব্দাবলির সাথে দ্বিতীয় সারির উপযুক্ত শব্দাবলি মিলাও

প্রথম সারি	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	দ্বিতীয় সারি
তাওহীদের শাব্দিক অর্থ:		১	ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহু) এর উক্তি: আমি যখন কাফেরকে দেখি তখন আমি আমার চক্ষুদ্বয় আল্লাহর শত্রুকে দেখার ভয়ে বন্ধ করে দেই।
তাওহীদের পারিভাষিক অর্থ:		২	মৃত্যুর পরে যা ঘটবে সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।
তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ:		৩	মুখে উচ্চারণ করা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা আর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও অবাধ্য কাজের মাধ্যমে তা হ্রাস পায়।
তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:		৪	ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত:		৫	আল্লাহ ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য।
একনিষ্ঠ বলতে বুঝায়:		৬	ওয়াজিব, জায়েয ও হারাম।
কুরআনে প্রথম আহ্বান ও আদেশের কথা উল্লেখ হয়েছে:		৭	শরীয়তগত ও অনুভূতিগত।
শিরক:		৮	কবরের প্রশ্নসমূহ।
ভয়-ভীতি:		৯	ইলম, আমল, দাওয়াত ও ধৈর্য।
তাওয়াক্কুল:		১০	ইখলাস ও আনুগত্য করা।
ইবাদত কবুলের শর্ত:		১১	আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা ও মাধ্যম গ্রহণ করা।
চারটি মাসআলাকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১২	আল্লাহর পরিপূর্ণ নেতৃত্ব ও মহানত্বের জন্য জ্ঞানার্জন করার ক্ষেত্রে অটুট ভয় থাকা।
তিনটি মাসআলাকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১৩	সমতুল্য, অনুরূপ, হুবহু।
মাধ্যম গ্রহণের প্রকারভেদ:		১৪	শিরক থেকে বিমুখ হয়ে তাওহীদের দিকে ধাবিত মিল্লাত।
তিনটি মূলনীতিকে সংক্ষেপে বলা হয়:		১৫	সূরা বাকারাহ।
মানতের প্রকার:		১৬	আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করা ঐ সকল নাম বা গুণের ব্যাপারে যেগুলো তিনি নিজেই তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে: আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা এবং তিনি তাঁর থেকে যা দূর করেছেন তা দূর করা কোনো ধরণের পরিবর্তন,নষ্ট করণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও উদাহরণ প্রদান ছাড়া।
যবেহ এর প্রকার:		১৭	ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
ভয়ের প্রকার:		১৮	সৃষ্টি, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
ইসলাম হলো:		১৯	যে বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট সে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে ঘোষণা করা।
দ্বীনের স্তরসমূহ:		২০	وَحَّدَ ক্রিয়ার মাসদার, যখন কোন কিছুকে এক বলে ঘোষণা করা হয়।

ঈমানঃ		২১	সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া বা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া।
কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত :		২২	ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে বান্দা তার সীমা অতিক্রম করা।
শিরক থেকে মুক্ত থাকার বাস্তবতা হচ্ছে:		২৩	তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও শিরক বা মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা।
তাওবা বন্ধের সময়:		২৪	একত্ববাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনুগত হওয়া ও শিরক বা মুশরিকদের হতে মুক্ত থাকা।
তাগুত:		২৫	যে-কোনভাবে আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়।

চারটি নীতি

ভূমিকা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

মূলভাষ্যের লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখুল ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রবক্তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত তামীমী। ডাক নাম আবুল হুসাইন। তিনি ১১১৫ হিজরীতে (সৌদি আরবের) উয়াইনা নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে দিরইয়াহ নামক স্থানে মারা যান।

দ্বিতীয় মতনটি (মূল পাঠ) হলো: চারটি নীতি

চারটি নীতি বইটি লেখকের দ্বিতীয় মূল বই যার পাঠক শিক্ষার্থীর মতনের (মূল পাঠ) ধারাবাহিকতায় হবে। আর এ মতনটির (মূল পাঠ) অনেক গুরুত্ব রয়েছে তার মধ্যে হতে:

১. মতনটি (মূল পাঠ) অধ্যয়ন করার জন্য আলেমদের নসীহত বাণী

২. সালফে সালেহীন আলেমগণের অনুসরণ করা

৩. বর্তমান সময়ের মুশরিকদের সংশয়ের প্রত্যুত্তর

৪. কেননা এটি লেখকের কাশফুশ শুবহাত (সন্দেহ উন্মোচন) বই এর সংক্ষেপণ

সুতরাং আমরা 'সন্দেহ উন্মোচন' বিষয়ক বইটি শুরু করার পূর্বে 'চারটি নীতি' বইটি দিয়ে শুরু করছি যাতে শিক্ষার্থীরা যেকোন সন্দেহের সম্মুখিন না হয়।

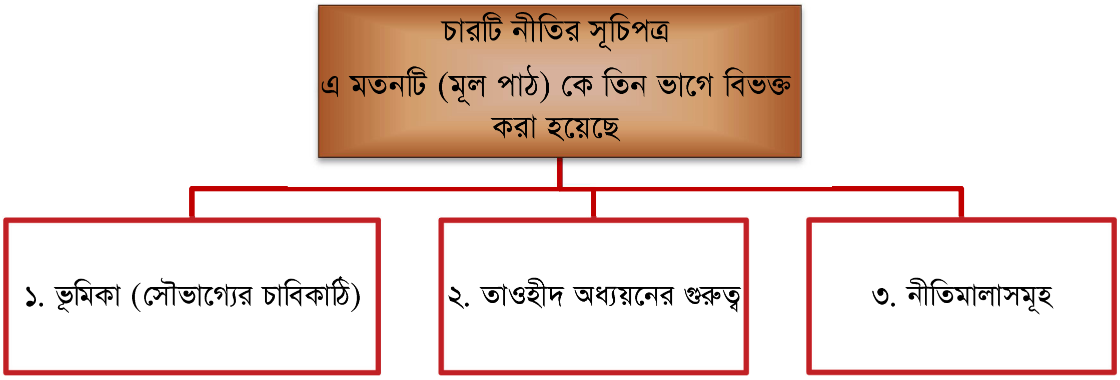
চারটি নীতির সূচিপত্র
এ মতনটি (মূল পাঠ) কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে
১. ভূমিকা (সৌভাগ্যের চাবিকাঠি)
২. তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব
৩. নীতিমালাসমূহ

প্রথমত: ভূমিকা (সৌভাগ্যের চাবিকাঠি)

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) আরশে আযীমের রব মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার অভিভাবক হন ও আপনাকে বরকতময় করেন আপনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন।

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এ মতনটি (মূল পাঠ) বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার কারণ

১. আল্লাহর কিতাব ও নাবীদের অনুসরণে।

২. তাঁর (লেখক) পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন আলেমগণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে। কেননা তাঁরা তাদের লিখন বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন।

৩. আল্লাহর নামের বরকত নেয়ার জন্য।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন: যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন ও তাক্বওয়াহ অবলম্বনকারী সে আল্লাহর অলী ।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

[يونس: ٦٢-٦٣]

অর্থ: ‘‘মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (তারা হলো): যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর তাক্বওয়াহ অবলম্বন করে।’’ (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)

البركة - বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া।

التبرك - বরকত বেশি পাওয়ার প্রার্থনা করা।

المبارك - যার দ্বারা সর্বাস্থায় উপকার লাভ করা যায়। সে যেখানেই অবতরণ করুক।

التبرك (আত-তাবাররুক) দু’ প্রকার

১. শারয়ীতগত বরকত উপার্জন করা। এটি আবার দুই প্রকার:

- ক. অনুভূতিগত: জ্ঞানার্জন করা ও দু'আ করা ইত্যাদি। সুতরাং ব্যক্তির জ্ঞানের ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে বরকত লাভ করা। তাই তা বরকত। কেননা আমরা এ বিদ্যা হতেই অনেক বরকত লাভ করেছি। যেমন শাইখুল ইসলাম ও অন্যান্য ইমামদের গ্রন্থাবলী যাতে মহান আল্লাহ তা'আলা বরকত ও কল্যাণ দিয়েছেন এবং জনগণ সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করছে।
- খ. শরীয়তগত: যেমন মাসজিদে হারাম বা মাসজিদ নববীতে সলাত আদায় করা।

২. নিষিদ্ধ বরকত উপার্জন: যে সকল বরকত নেয়ার ব্যাপারে শারয়ী বা অনুভূতিগত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তোমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবে, যাকে কিছু প্রদান করা হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।(১)

(১) নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী:

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء: ٣٥]

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি।" (সূরা আল-আম্বিয়া:৩৫)

আল্লাহ আরোও বলেছেন:

فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ [النمل: ٤٠]

অর্থ: "অতঃপর যখন সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তার সামনে আরশকে দণ্ডায়মান দেখলেন, তখন তিনি বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।" (সূরা আল- নামল:৪০)

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ [الفجر: ١٥]

অর্থ:" মানুষ এরূপ যে যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাক সম্মান দান করেছেন।" (সূরা আল-ফাজর:১৫)

হাদীসে এসেছে: (বাণী ইসরাঈল বংশের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেছিলেন-------)

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ নি'য়ামতের সাথে সম্পর্কিত। আর নি'য়ামতের কৃতজ্ঞতা করা দু' ভাগে বিভক্ত

১. নিয়ামত পাওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা।

এই প্রকারটি প্রমাণ করে যে, বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে যে, মহান আল্লাহই নিয়ামতদাতা। সুতরাং তার অন্তর অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না আর কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই কল্যাণ কামনা করবে। যেমন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করা হয়। কেননা তিনিই জান্নাতের মালিক। অনুরূপভাবে রিযিকও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ [الفرقان: ٥٨]

অর্থ: তুমি ভরসা কর চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না। (সূরা আল-ফুরকান: ৫৮)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ [العنكبوت: ١٧]

অর্থ: তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করছ তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক কামনা কর। (সূরা আল-আনকাবূত:১৭)

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট রিযিক প্রার্থনা করা যাবে না।

واعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ [العنكبوت: ١٧]

অর্থ: তোমরা তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(সূরা আল-আনকাবূত:১৭)

২. নিয়ামত পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তা হবে:

ক. অন্তরের মাধ্যমে: তা হলো সত্যিকার ঈমান, বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা যে, আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দাতা ও নিয়ামত দাতা। আর প্রত্যেকটি নিয়ামত বান্দা আল্লাহর পক্ষ হতেই পায়।

খ. জিহ্বার মাধ্যমে: তা হলো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের ব্যাপারে মুখে আলোচনা করা নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করা,কৃতজ্ঞতা করা ও তাঁর গুণগান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: ١١]

অর্থ: আর তোমার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ কর।

(সূরা আল-দ্বুহা: ১১)

গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে: তা হলো নিয়ামতের ব্যবহার এমন ভাবে করা যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর খুশি হন এবং সাথে সাথে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য আনুগত্যের আমল করা ও অবাধ্য কাজ হতে বিরত থাকা।

এবং যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে।[১]

(১) সকল আলেমদের মতে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।

ধরণীতে বিপদগ্রস্থের দিক দিয়ে মানুষ চার প্রকার

১. অসন্তুষ্ট ব্যক্তি | ২. ধৈর্য ধারণকারী | ৩. সন্তুষ্ট ব্যক্তি | ৪. কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী

(১) অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম। এটা কাবীরা গুনাহ। এটি হয়ে থাকে:

অন্তরের মাধ্যমে | জিহ্বার মাধ্যমে | অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে

অন্তরের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন এর অর্থ হলো: কিছু মানুষ মুখে উচ্চারণ করে না কিন্তু তার অন্তর বলে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমাকে বঞ্চিত করেছে ও আমাকে বাধা প্রদান করেছে। সে অল্প বলুক কিংবা বেশি বলুক। সুতরাং তুমি তোমার মনে মনে চিন্তা কর যে, তুমি কি তা হতে মুক্ত? যদি তুমি তা হতে মুক্ত থাকতে পার তাহলে তুমি বড় পাপ থেকে মুক্ত থাকবে।

জিহ্বার মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: তা আত্ম-চিৎকার, বিলাপ সুরে কান্না করা, অভিশপ্ত কথা বলা, লা'নাত বা গালিগালাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হওয়া: এটা গাল আঁচড়ানো, পোশাক ছিঁড়ে ফেলা ও মাথার চুল উঠিয়ে ফেলা ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

(২) ধৈর্য ধারণ করা: এর হুকুম সকল আলেমদের ঐকমত্যে ওয়াজিব বা আবশ্যক। অন্তরের মাধ্যমে, জিহ্বার মাধ্যমে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: কুরআনুল কারীমে ৯০ জায়গায় ধৈর্য ধারণের কথা এসেছে। সকল আলেমদের ঐকমত্যে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অর্ধেক। কেননা ঈমান দু' ভাগে বিভক্ত: অর্ধেক ধৈর্য ধারণের এবং অর্ধেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। (মাদারিজুস সালেকীন–ইবনুল কাইয়িম)

(৩) সন্তুষ্ট থাকা। এর হুকুম মুস্তাহাব। এটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর।

(৪) কৃতজ্ঞতা করা। এর হুকুম মুস্তাহাব। এটা সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ স্তর।

দ্বিতীয়ত: চারটি নীতি

بسم الله الرحمن الرحيم

জেনে নিন- আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ দেখাক- নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত দীন তথা মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে, আপনি কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবেন তার জন্য আনুগত্যকে নির্ভেজাল করে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে এরই আদেশ করেছেন এবং এর জন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦]

অর্থ: ''আমি তো জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।''[১] [সূরা আয-যারিয়াত/৫৬]

অতঃপর যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন এটাও জেনে নিও যে, তাওহীদ ব্যতীত কোনো ইবাদতই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না, যেমন পবিত্রতা ব্যতীত কোনো সালাতই সালাত হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং ইবাদতে শির্ক প্রবেশ করলে তা তেমনি নষ্ট হয়ে যায় যেমনিভাবে পবিত্রতা অর্জনের পর বায়ু নির্গত হলে তা বিনষ্ট হয়।

অতঃপর যখন জানলে যে, যখন ইবাদতে শির্কের সংমিশ্রণ হয় তখন শির্ক সেই ইবাদতকে নষ্ট করে দেয় এবং যাবতীয় আমল ধ্বংস করে ফেলে এবং সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন তুমি বুঝতে পারলে যে, এ বিষয়টির জানাই হচ্ছে তোমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাতে করে আল্লাহ তোমাকে এ বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেন, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা তথা শির্কের বেড়াজাল। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ [النساء: ٤٨]

অর্থ: ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করাকে ক্ষমা করবেন না, আর এর চেয়ে ছোট যা আছে তা তিনি যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।''[সূরা আন-নিসা-৪৮]

আর এটা (অর্থাৎ শির্কের বেড়াজাল থেকে মুক্তি) কেবল চারটি নীতি জানার মাধ্যমে সম্ভব হবে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

প্রথম নীতি: জানা প্রয়োজন যে, ঐ সমস্ত কাফের যাদের সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছিলেন, তারা স্বীকার করত যে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর পরিচালক। তবুও এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করায়নি।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ [يونس: ٣١]

অর্থ: ''তুমি বল : তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক দিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ। অতএব, তুমি বল: তবে কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?''[২] (সূরা ইউনুস: ৩১)

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো?

(২) যে সকল কাফেরদের মাঝে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকারোক্তি দেওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কারণ তাদের ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যেকোন ইবাদত সম্পাদন করবে সে কাফের ও মুশরিক।

দ্বিতীয় নীতি: আরবের মুশরিকরা বলত: আমরা তো তাদেরকে কেবল নৈকট্য এবং সুপারিশ পাওয়ার আশায় আহ্বান জানাই এবং তাদের শরণাপন্ন হই।
তারা যে (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করে তাদের (মা‘বুদদের) আহ্বান করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ [الزمر: ٣]

অর্থ: ‘‘আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের ইবাদত এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।’’[১] [সূরা আয-যুমার:৩]

আর তারা যে (আল্লাহর কাছে এসব মা‘বুদদের) শাফা‘আত বা সুপারিশ প্রত্যাশা করে তাদের (মা’বুদদের) আহ্বান করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ [يونس: ١٨]

অর্থ: ‘‘আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে: এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।’’ [সূরা ইউনুস-১৮]

বস্তুত সুপারিশ বা শাফা‘আত দু’ প্রকার। ক) অস্বীকৃত খ) স্বীকৃত।[২]

(১) কাফের ও মুশরিকরা তাদের বাতিল মা‘বুদদের আহ্বান করে শুধু নৈকট্য লাভ ও শাফাআ‘তের আশায়। এ জন্যই রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কাফের বলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

(২) **الشفاعة** বা সুপারিশ এর পরিচয়:

শাব্দিক পরিচয়: একক বিষয়কে দ্বিত্ব করণ।

পারিভাষিক পরিচয়: উপকারার্থে বা ক্ষতি প্রতিকারার্থে অন্যের জন্য মাধ্যম হওয়া।

الشفاعة বা সুপারিশ এর প্রকারভেদ

(১) স্বীকৃত শাফা'আত। যা শুধু আল্লাহর নিকট চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে:

ক. শাফাআ'তের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকা।

খ. শাফা'আতকারীর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকা।

গ. শাফা'আতকৃত ব্যক্তির উপরও আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকা।

স্বীকৃত শাফা'আত দু' প্রকার:

- ১. একমাত্র রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন:
  - বড় শাফা'আত (হাশরের মাঠে)
  - তাঁর চাচা আবু তালেবের শাস্তি কমানোর শাফা'আত।
  - জান্নাতের দরজা খোলার শাফা'আত।
- ২. সকল রাসূল, নাবী, ফেরেশতা, একত্ব ঘোষণাকারী ও শিশুদের জন্য। যেমন:
  - একত্ব ঘোষণাকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির শাফা'আত।
  - যে সকল একত্ব ঘোষণাকারীর জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক হবে তাদের জাহান্নামে না যাওয়ার শাফা'আত।
  - যে সকল একত্ব ঘোষণাকারী জাহান্নামে যাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার শাফা'আত।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি শাফা'আত করার ক্ষমতা রাখে। এটা চারটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয আছে:

১. (যার নিকট শাফা'আত কামনা করা হবে) সে উপস্থিত থাকা

২. জীবিত থাকা

৩. (শাফা'আত করতে) সক্ষম থাকা

৪. (শাফাআ'তের) মাধ্যম হওয়া।

(৩) অস্বীকৃত শাফা'আত। যে শাফা'আতকে কুরআন অস্বীকার করেছে।আর তা হলো: যে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা রাখেন তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা। এটা বড় শিরক।

সুতরাং অস্বীকৃত সুপারিশ হচ্ছে, যে সকল ক্ষেত্রে কেবল মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা রাখেন তা তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ [البقرة: ٢٥٤]

অর্থ: ''হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা হতে সে দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর; যাতে থাকবে না কোনো ক্রয়-বিক্রয়, কিংবা বন্ধুত্ব অথবা সুপারিশ, আর কাফেররাই তো অত্যাচারী।"[সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৪]

স্বীকৃত সুপারিশ হচ্ছে, যা কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। বস্তুত সুপারিশকারীর কাছে সুপারিশ চাওয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হয়। আর যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে তো হতে হবে এমন ব্যক্তি যার কথা ও কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর তার সুপারিশ হবে অনুমতি পাওয়ার পরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ [البقرة: ٢٥٥]

অর্থ: ''এমন কে আছে যে অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?'' [সূরা আল-বাক্বারাহ/২৫৫]

তৃতীয় নীতি: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন ঘটে এমন লোকদের মাঝে যারা তাদের ইবাদতে শতধা বিভক্ত ছিল; তাদের মধ্যে কেউ ফেরেশতার ইবাদত করতো, কেউ নাবী ও সৎ লোকদের ইবাদত করতো, কেউ গাছ-পালা ও পাথরের পূজা করতো এবং কেউ সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করতো। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য বা পার্থক্য করা ছাড়াই এদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ [الانفال: ٣٩]

অর্থ: ''আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায়।'' [সূরা আল-আনফাল/৩৯]

তারা যে সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ [فصلت: ٣٧]

অর্থ: ''তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।'' [সূরা ফুসসিলাত-৩৭]

তারা যে ফেরেশতার ইবাদত করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًا [ال عمران: ٨٠]

অর্থ: ''আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণ ও নাবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে।''[সূরা আলে ইমরান/৮০]

মাক্কার কাফেররা যে নাবীগণের ইবাদত করত তার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ [المائدة: ١١٦]

অর্থ: ‘‘আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা,বূদ বানিয়ে নাও? ঈসা নিবেদন করবেন আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি; আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলবার আমার কোনই অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা আছে; আপনি তো আমার অন্তরের কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা রয়েছে আমি তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।’’ [সূরা আল-মায়েদা-১১৬]

মাক্কার লোকরা যে নেককার লোকদের ইবাদত করত তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ [الاسراء: ٥٧]

অর্থ: ‘‘তারা যাদের আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে বেড়ায় যে তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।’’ [সূলা আল-ইসরা/৫৭]

তৎকালীন মক্কার লোকেরা যে গাছ-পালা ও পাথরের ইবাদতও করত তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ [النجم: ١٩، ٢٠]

অর্থ: ‘‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, ও `উযযা, সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি `মানাত, সম্বন্ধে?’’ [সূরা আন-নাজম/১৯-২০]

অনুরূপভাবে আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) হাদীসও এর প্রমাণ, তিনি বলেন:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط....... الحديث.

অর্থ: ‘‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম, আমরা তখন নূতন মুসলিম ছিলাম। সেকালে মুশরিকদের একটি কুল-বৃক্ষ ছিল, যার পার্শ্বে তারা অবস্থান করতো এবং তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। ওটাকে বলা হত যাতু আন্ওয়াৎ (বরকতের গাছ)। আমরা এ ধরনের এক কুল-গাছের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন আমরা আল্লাহর রাসূলকে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যও একটি ঝুলিয়ে রাখার বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের রয়েছে------। আল-হাদীস।

চতুর্থ নীতিঃ আমাদের যুগের শিরককারীদের শিরক পূর্বের যুগের শিরককারীদের থেকে অধিকতর বেশি অন্যায়। কারণ পূর্বের লোকেরা সুখ-সচ্ছলতার সময় শিরক করতো আর দুঃখের সময় একান্তভাবে আল্লাহকেই ডাকতো। কিন্তু আমাদের যুগের শিরককারীরা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করে।

এর দলীল আল্লাহর বাণী,

(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) [العنكبوت: ٦٥]

অর্থ: ‘‘অতঃপর তারা যখন নৌকায় আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে খাঁটিভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা শিরক করতে থাকে।’’ [১] [সূরা আল-আনকাবূত-৬৫]

আল্লাহই সর্বোজ্ঞ। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

(১) লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এ নীতিটিতে বর্তমান সময়ের মুশরিকদের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা তারা পূর্ববর্তী মুশরিকদের চেয়ে বেশি শিরক করছে। বর্তমান সময়ের মুশরিকরা সুখে-দুঃখে সর্বাস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করছে। আর পূর্ববর্তী মুশরিকরা সুখে-সমৃদ্ধিতে আল্লাহর সাথে শিরক করতো আর বিপদে আল্লাহকে আহ্বান করতো এবং তাঁর এককত্ব ঘোষণা করতো।

যে সকল কাফেরদের মাঝে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, যদি তাদের অল্প শিরক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে কাফের বলেন, তাহলে যারা সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বস্থায় শিরক করছে তাদের কী অবস্থা হবে? সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে তারাই হবে প্রথম সারির কাফের।

চারটি নীতি: তা কাশফুশ শুবহাত (সন্দেহ উন্মোচন) কিতাবের সারাংশ।

ভূমিকা ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

যখন নিয়ামত দেয়া হয় তখন কৃতজ্ঞতা করে।

নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ। এর প্রমাণ হলো, وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء: ٣٥]
অর্থ: আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি। (সূরা আল-আম্বিয়া:৩৫)

- **নিয়ামতের শুকরিয়া করা:**
  - **রুবুবিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত:** আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করা হয়। কেননা তিনিই জান্নাতের মালিক। অনুরূপভাবে রিযিকও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সুতরাং এটা শুধু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। অন্য কারো সাথে নয়।
  - **তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত:**
    - ক. অন্তরের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: তা হলো পূর্ণ ঈমান রাখা, বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেয়া যে, প্রত্যেকটি নিয়ামত বান্দা আল্লাহর পক্ষ হতেই পায়।
    - খ. জিহ্বার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ [النمل: ٤٠] অর্থ: "তিনি বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃজ্ঞ হই।" (সূরা আল-নামল:৪৫)
    - গ. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা করা: নি'য়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা করে নি'য়ামত ব্যবহার করা। প্রত্যেকটি নিয়া'মত যথাযথ ব্যবহার করা। সুতরাং ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হলো, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করা। আর ইলম বা বিদ্যার কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হলো, বিদ্যা সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদের কাছে তার বর্ণনা দেয়া। হয়তো সেটি মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে হবে কিংবা লিখনীর মাধ্যমে হবে।
- **বিপদের সময় মানুষের অবস্থা:**
  - অসন্তুষ্ট ব্যক্তি: এর হুকুম হলো কাবীরা গুনাহ। এটা কখনো কখনো শিরকে আছগার বা ছোট শিরক হয়ে যায়। অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে অন্তর, জিহ্বা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে।
  - ধৈর্য ধারণকারী: সকল আলেমদের ঐকমত্যে অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। ধৈর্য নামটি তিক্ত কিন্তু তার শেষ ফলাফল মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি।

				সন্তুষ্ট ব্যক্তি: এর হুকুম মুস্তাহাব। আর তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, সে একথা বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
				কৃতজ্ঞতা কারী: এটা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক প্রিয় স্তর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারীরাই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বান্দা হয়।
	পাপ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে।			
		আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো? ও শিরকের ভয়াবহতা	الحنيفية এর পরিচয়: একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মিল্লাত। আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাওহীদ ব্যতীত ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। যখন ইবাদতের সাথে শিরক সংমিশ্রিত হয় তখন ইবাদতকে বাতিল করে দেয়, আমলকে বাতিল করে দেয় ও এ ধরণের আমলকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। সুতরাং তোমার উপর করণীয় হলো, এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।	
	চারটি নীতি	প্রথম নীতি: ঐ সমস্ত কাফের যাদের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করত কিন্তু তারা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ অস্বীকার করত। তবুও এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করায়নি।		
		দ্বিতীয় নীতি: কাফের ও মুশরিকরা তাদের বাতিল মা'বুদদের আহ্বান করে শুধু নৈকট্য লাভ ও শাফাআ'তের আশায়।		
		তৃতীয় নীতি: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন ঘটে এমন লোকদের মাঝে যারা তাদের ইবাদতে শতধা বিভক্ত ছিল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করেননি।		
		চতুর্থ নীতি: আমাদের যুগের শিরককারীদের শিরক পূর্বের যুগের শিরককারীদের থেকে অধিকতর বেশি অন্যায়।		

চারটি নীতির পরীক্ষা

ছাত্রের নাম---------------------------------- কিতাবুত তাওহীদ মুখস্থের পরিমাণ-----------------------------

তুমি কি চারটি নীতি মুখস্থ করেছ ----------------------------

আমল	কুরআন ও হাদীস হতে দলীল
১. নিয়ামত পরীক্ষাস্বরূপ	
২. কাফেরদের তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকারোক্তি	
৩. নৈকট্য লাভের প্রার্থনা	
৪. অস্বীকৃতি শাফা'আত	
৫. চন্দ্র-সূর্য ব্যাপারে দলীল	
৬. ফেরেশতাদের ব্যাপারে দলীল	
৭. নাবীদের ব্যাপারে দলীল	
৮. সৎ বান্দাদের ব্যাপারে দলীল	
৯. গাছ-পালা ও পাথরের ব্যাপারে দলীল	
১০. মুশরিকরা বিপদে আল্লাহকে আহ্বান করতো এবং সুখ-সচ্ছলতায় শিরক করতো	
১১. শিরকের দলীল	

নিম্নে বর্ণিত প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ

১. আমরা কেন তাওহীদ অধ্যয়ন করবো?	১. ২. ৩. ৪.
৫. ৬. ৭. ৮. ৯.	
২. আমরা কেন চারটি নীতি অধ্যয়ন করবো?	১. ২.
৩. ৪.	
৩. চারটি নীতির প্রকারভেদ সমূহ	১. ২. ৩.
৪. চারটি নীতি একটি কিতাবের সারাংশ	
৫. আমরা কেন কাশফুশ শুবহাত বইটি অধ্যয়ন করবো?	
৬. সৌভাগ্যের চাবিকাঠি	
৭. الحنيفية এর পরিচয়:	১. ২. ৩.
৮. চারটি নীতি অধ্যয়নের উপকারিতা	
৯. আল্লাহর অলী কারা:	শাইখুল ইসলাম বলেছেন:
১০. আল্লাহর অলীদের ব্যাপারে দলীল	এবং কেন:
১১. নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা উদাহরণসহ বল	১.
২.	
৩.	
১২. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কেমন হবে?	
১৩. বিপদের সময় মানুষের অবস্থাসমূহ হুকুমসহ উল্লেখ কর	১. ২.
৩. ৪.	
১৪. শাফাআ'তের শাব্দিক পরিচয়:	শাফাআ'তের পারিভাষিক পরিচয়:
১৫. শাফা'আতের প্রকার	১. ২.
১৬. স্বীকৃত শাফাআ'তের শর্ত সমূহ	১. ২. ৩.
স্বীকৃত শাফাআ'তের প্রকার: ১.	এর প্রকারভেদ: ক. খ.
২. এর প্রকারভেদ:	ক. খ.
১৭. প্রথম নীতি	
১৮. দ্বিতীয় নীতি	
১৯. তৃতীয় নীতি	
২০. চতুর্থ নীতি	
২১. কোনো আমলের সাথে যখন শিরক সংমিশ্রিত হয় তখন তার হুকুম কী?	দলীল:

ব্যাখ্যামূলক

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ

متن نواقض الإسلام

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ) বলেন: ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি

প্রথম : আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতে অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে শির্‌ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা নিসা-৪৮] তিনি আরও বলেন : إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার আশ্রয় স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়েদা-৭২] আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য যবেহ করা শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত। যেমন জ্বিন বা কবরবাসীর সন্তুটির উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

দ্বিতীয় : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করে, তাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের হয়ে যাবে।

তৃতীয় : যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে করেনা, অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কাফির হয়ে যাবে।

চতুর্থ : যে ব্যক্তি বিশ্বাস পোষণ করেন যে, নবী (সঃ) এর আদর্শের চেয়ে অন্য আদর্শ আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ অথবা তাঁর হুকুমের চেয়ে অন্যের হুকুম বেশি উত্তম। (ঐ সকল লোকদের মত যারা তাগুতের হুকুমকে রাসূলের হুকুমের উপর প্রাধান্য দেয়) সে কাফির হয়ে যাবে।

পঞ্চম : রাসূল (সঃ) এর আনীত কোন হুকুমকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে ঐ হুকুম অনুযায়ী আমল করে।

ষষ্ঠ : যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর দ্বীনের কোন বিষয়কে অথবা সওয়াব বা শাস্তি নিয়ে বিদ্রুপ করে সে কাফির বলে বিবেচিত। এ কথার দলিল : আল্লাহ তা'য়ালার বাণী : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ "তুমি বলে দাও : তবে কি তোমরা আল্লাহ; তার আয়াতসমূহ, তার রাসূলের প্রতি হাসি তামাশা করছিলে?" "ঈমান আনার পর তোমরা ওযর আপত্তি করনা" [সূরা তাওবাহ-৬৫-৬৬]

সপ্তম : যাদু করা। যেমন এর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো বা এর মাধ্যমে প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করা। যে ব্যক্তি এ কাজ করল বা এ কাজের উপর সন্তুষ্ট থাকল সে কুফরী করল। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "আর তারা উভয়ে কাউকে এটা শিক্ষা দিতনা, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করনা।" [সূরা বাকারা-১০২]

অষ্টম : মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা। এর দলিল আল্লাহ তা'য়লা বলেন : وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা-৫১]

নবম : যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ) এর শরীয়াত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। যেমন খিজিরের জন্য মুসা (আ)এর শরীয়াত থেকে বের হওয়ার সুযোগ ছিল সে কাফির হয়ে যাবে।

দশম : আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। দীন সম্পর্কে না জানা এবং তদানুযায়ী আমল না করা। এর সমর্থনে দলিল : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা : সাজদাহ-২২]

ইসলাম বিধ্বংসী এ সকল কাজ উপহাসের সাথে করা হোক অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক অথবা ভয় করে করা হোক (ইসলাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে) এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে কাউকে জোর পূর্বক বাধ্য করা হলে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে না। এ গুলোর প্রতিটি কাজ অত্যন্ত বিপদজনক বা ভয়াবহ। এ সব কাজ সচরাচর ঘটে থাকে। তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ এ সমস্ত বিষয় থেকে সতর্ক থাকা এবং নিজে তাতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করা। আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় এমন বিষয় সমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সঃ) তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ব্যাখ্যা

লেখকের ভূমিকা

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
জেনে রাখ : ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি।

আলেমগণ কেন তাদের কেতাবকে "বিসমিল্লাহ" দিয়ে শুরু করেছেন?"

- মহিমান্বিত কিতাব আল কুরআনুল ক্বারীম ও নবী-রাসূল (সঃ)-গণের অনুসরণ করার জন্য।
- প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ "বিসমিল্লাহ" ছাড়া শুরু করা হলে তা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এ হাদীসের উপর আমল করার জন্য। যদিও হাদিসটি দুর্বল।
- সালফে সালেহীনদের অনুসরণার্থে।
- আল্লাহ তা'য়ালার নাম দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে বরকত হাসিল করার জন্য।

কিতাব ও সুন্নাহ-তে যখন নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ্য করা হবে :

- যখন কিতাব ও সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট দলিলে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি বুঝাচ্ছে এমন কিছু না পাওয়া যাবে তখন ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ঐ সংখ্যার উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করা যাবে না। যেমন ইসলাম ও ঈমানের রুকুন সমূহ হাদীসে জিব্রাঈল দ্বারা প্রমাণিত।
- আর কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা যদি ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি বুঝাচ্ছে এমন কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ সংখ্যার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ দলিলের আলোকে তার উপর বৃদ্ধি করা যাবে। যেমন রাসূল (সঃ) এর বাণী "পাঁচটি বিষয় ফিৎরাতের অন্তর্ভূক্ত" এবং "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক"। ফিৎরাতের বিষয় পাঁচটিতে সীমবদ্ধ নয় কেননা অন্য হাদীসে এর বেশি পাওয়া যায়। অনুরূপ ধ্বংসাত্মক বিষয় সাতটিতে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা কখনো কখনো এ নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি পাওয়া যায়।

কেন কখনো কখনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ তার কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই?

এটি নবী (সঃ) এর শিক্ষাদানের একটি চমৎকার কৌশল। এর মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাতে শ্রোতারা মাজলিসে আলোচিত বিষয়গুলো সংরক্ষণ করতে পারে। এমনকি দীর্ঘ সময়ের পরেও যেন এ মাসাআলাগুলো সহজে মনে রাখতে পারে। যেমন নবী (সঃ) এর বাণী তিনটি বিষয়ে আমি কসম করছি এবং তোমাদেরকে হাদীসে শুনাচ্ছি। সেগুলো তোমরা মুখস্থ রাখো সাদকা করার করণে কোন বান্দার সম্পদ কমেনা ......। লেখক এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ্য করেছেন।

আমরা কেন ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় সমূহ অধ্যয়ণ করবো?

আমরা ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় সমূহ অধ্যয়ণ করব। কারণ হলো আমরা যেন তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি এবং তাতে কোন ভাবে জড়িত না হই। এর বিরাট উপকার রয়েছে। কারণ এটি সবচেয়ে বেশী উপকারী বিষয়। যেমন আমরা ওযু ভঙ্গকারী বিষয় গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি, যেন আমাদের ওযু নষ্ট না হয়। আবার সালাত নষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যেন আমাদের সালাত কোন ভাবে বাতিল না হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে আমরা ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় গুলো অধ্যয়ণ করবো, যেন আমাদের ইসলাম কোন ভাবে নষ্ট না হয়। হুজাইফা বিন ইমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন সাধারণত মানুষেরা রাসূল (সঃ) কে কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর আমি অকল্যাণ কর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম যেন আমি তাতে জড়িয়ে না পড়ি।

নাওয়াকেযুল ইসলাম কি?

নাওয়াকেযুল ইসলাম হলো ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ। এর মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে বড় কুফরীতে লিপ্ত হয়। আর ইসলাম হলো একত্ববাদের ভিত্তিতে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা, চূড়ান্ত আনুগত্যের মাধ্যমে তার কথা মেনে চলা এবং শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহের তাৎপর্য ঃ তা এমন বিষয় যার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে বড় কুফরীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এ ধরণের জঘণ্য অপরাধ থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।

আলেমগণ কেন ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় গুলোকে কখনো نواقض কখনো مفسدات আবার কখনো مبطلات দ্বারা প্রকাশ করেছেন? আলেমগণ এটিকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন, যেন ছাত্ররা একই শব্দ বারবার শুনে বিরক্তবোধ না করে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি অর্থ একই।

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় গুলোর ব্যাপারে কি আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন? হ্যাঁ একমত পোষণ করেছেন।

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় গুলো কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ? না সীমাবদ্ধ নয়। তাহলে কেন বলা হয়েছে ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় দশটি? এই দশটি বিষয় অন্য গুলোর চেয়ে মারাত্মক এবং এগুলো মুখস্থ রাখার জন্য।

সাধারণ ভাবে ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়গুলো কি সীমাবদ্ধ করা সম্ভব?

কথার মাধ্যমে: যেমন আল্লাহ অথবা রাসূল বা দীন ইসলামকে গালি দেয়া।

কাজের মাধ্যমে: যেমন যাদু করা।

বিশ্বাসের মাধ্যমে : যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপকার করার ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

সন্দেহের মাধ্যমে : যেমন যে সকল ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের নিকট নবী (সঃ) এর দাওয়াত পৌঁছেছে অথচ তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তাদের কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা।

নবী (সঃ) কি এই দশটি ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় উল্লেখ্য করেছেন? তার দলিল কি?

হ্যাঁ নবী (সঃ) এ দশটি বিষয়ের প্রত্যেকটি উল্লেখ করেছেন। বরং প্রত্যেকটি ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ের জন্য কুরআন সুন্নাহ থেকে দলিল রয়েছে। আল্লাহ বলেন : وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ "আমি আমার আয়াত ও নিদর্শন সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যেন অপরাধী লোকদের কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।" [আনআম : ৫৫]

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিকে যারা দেখবে-জানবে তারা প্রত্যেকেই কি তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করবে?

না, কাউকে নির্দিষ্টভাবে কাফের সাব্যস্ত করতে হলে কুরআন সুন্নাহ'র বিজ্ঞ আলেম এবং শারঈ আদালতের স্বরণাপন্ন হওয়া জরুরী। নবী (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করলে তাদের দুইজনের একজন কাফের হয়ে যাবে।

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ে কে কে কিতাব রচনা করেছেন?

ফিকহ বিষয়ে সে সকল আলেম কিতাব রচনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই ধর্মত্যাগীর বিধি-বিধান "অধ্যায়ে" ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। তবে এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে লেখক (রহ) সর্ব প্রথম কিতাব রচনা করেছেন।

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে স্বয়ং ইসলাম বিধ্বংসী কাজ ও তা সম্পাদন কারীর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই কেননা কুফুরে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই কাফির নয়। নির্দিষ্ট কাউকে কাফির বলতে হলে তার সামনে দলিল উপস্থাপন করে তার নিকট সৃষ্ট সন্দেহ দূর করা আবশ্যক। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হলো এ সকল বিষয় থেকে জাতিকে সতর্ক করা। আর এটি জাতিকে সদুপদেশ দেয়ার অন্তর্ভূক্ত ।

ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় সমূহ অধ্যায়ণ কারীর করণীয় কী?

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য করণীয় হলো এই বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা। এবং নিজে তাতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করা ও অন্যকে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করা। আর ব্যক্তি বিশেষের উপর কুফুরীর হুকুম আরোপ করার জন্য বড় বড় আলেমদের ও শারঈ আদালতের স্বরণাপন্ন হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ "তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অতীকষ্টদায়ক মনে হয়, যিনি হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ন। অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাওঃ আমার জন্যে তো আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই আমি তারই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন মহা আরশের মালিক।" [সূরা তাওবা : ১২৮-১২৯]

ইসলাম বিধ্বংসী প্রথম বিষয় ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতে অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে শির্‌ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা নিসা-৪৮] তিনি আরও বলেন : إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার আশ্রয় স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়েদা-৭২] আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য যবেহ করা শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত। যেমন জ্বিন বা কবরবাসীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

শির্‌কের প্রকার ভেদ ঃ

বড় শির্‌ক : এর স্বরূপ হলো এই বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীতে গাইরুল্লাহর সুপ্ত কতৃত্ব বা ক্ষমতা রয়েছে অথবা তার উপকার সাধন করা বা ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রয়েছে।	ছোট শির্‌ক : এর স্বরূপ হলো আল্লাহ তা'য়ালা যে বিষয়কে মাধ্যম বানাননি সেটিকে মাধ্যম বানানো এবং বড় শির্‌কের দিকে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি বিষয় ছোট শির্‌ক ।
* এ শির্‌ক মুসলিম ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। * সকল আমল নষ্ট করে দেয়। * রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তাকে হত্যা করা এবং তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ হয়ে যায়। * তার জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। * শরীয়তের ভাষায় ঐ ব্যক্তিকে বড় শির্‌কে লিপ্ত বলে অবিহিত করা হয়। * শরীয়তের প্রমাণাদিতে শির্‌ক ও কুফুর শব্দদ্বয় আলিফ লাম যুক্ত মারেফা হয়ে ব্যবহার হলে বড় শির্‌ক বা বড় কুফর বলে বিবেচিত হয়।	* এ শির্‌ক মুসলিম ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বের করেনা। * শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আমল নষ্ট করে। * এ প্রকার শির্‌কে লিপ্ত ব্যক্তি কে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ নয়। * তার জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী ভাবে নির্ধারিত হয় না। * শরীয়তের ভাষায় ঐ ব্যক্তিকে ছোট শির্‌কে লিপ্ত বলে বিবেচিত করা হয়। * শরীয়ত যে সকল বিষয় শির্‌ক বা কুফর বলে অবিহিত করেছে এবং ঐ কুফর ও শির্‌ক শব্দকে "আলিফ লাম" দিয়ে নির্দিষ্ট করেনি এমন প্রত্যেক বিষয় ছোট শির্ক।

বড় শির্‌ক ক্ষমা করা হবে কি?

তওবা না করে মারা গেলে ক্ষমা করা হবে না। দলিল আল্লাহর বাণী إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে শির্‌ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। " [সূরা নিসা-৪৮]

তওবা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "বলঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার-৫৩]

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্বেই তওবা করতে হবে। দলিল নবী (সঃ) বলেন, তওবার দরজা বন্ধ না হওয়ার পর্যন্ত হিজরতের দরজা বন্ধ হবে না। আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া বা মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দরজা বন্ধ হবে না। আল্লাহ বলেন : وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ "আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে, যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে; নিশ্চয় আমি এখন তওবা করছি।" [সূরা নিসা-১৮]

হারাম কাজের প্রকারভেদ

- বড় শির্ক : এটি সবচেয়ে জঘণ্য নিষিদ্ধ কাজ।
- ছোট শির্ক : এটি বড় শির্কের চেয়ে নিচু। তবে তা কাবীরাহ গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক।
- বড় গুনাহ : এমন প্রত্যেক গুনাহ যার ব্যাপারে নির্দিষ্ট শাস্তি আরোপ করা হয়। আর ঐ গুনাহের কাজে জড়িত ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ অথবা তাকে কাফের বা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত বলে ঘোষণা প্রদান অথবা তাকে নির্দিষ্ট প্রাণীর সাথে সাদৃশ্য দানের মাধ্যমে হতে পারে।
  - কাবীরাহ গুনাহের সংখ্যা: এর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। তবে উপরে উল্লেখিত নিয়মের আলোকে সীমাবদ্ধ।
  - কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান : অসম্পূর্ণ ঈমানের অধিকারী মুমিন। অথবা তাকে তার ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুমিন এবং তার কাবীরাহ গুনাহের কারণে ফাসেক বলে অবিহিত করা হবে। কাবীরাহ গুনাহ লিপ্ত অবস্থায় তার সাথে উঠা বসা ও চলাফেরা করা যাবে না।
  - কাবীরাহ গুনাহের শ্রেণী বিন্যাস : নবী (সঃ) এর বাণী সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাবীরাহ গুনাহের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।
  - কাবীরাহ গুনাহের বিধান: কাবীরাহ গুনাহের জন্য তওবা করা অপরিহার্য। দলিল নবী (সঃ) বলেছেন: "বিলাপ কারিণী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে। অন্য হাদীসে বলেছেন যখন কাবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হবে।
- ছোট গুনাহ : ঐ প্রত্যেক গুনাহ যাতে জড়িত হতে শরীয়ত প্রণেতা নিষেধ করেছে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তি আরোপ করা হয়নি।

যবেহ-এর প্রকারভেদ

- আল্লাহর জন্যই যবাই করা। এটি শরীয়ত সম্মত। হজ্জ, কুরবাণী ও সাদকার পশু যবেহ করা এ প্রকারে অন্তর্ভূক্ত।
- গাইরুল্লাহর মুহব্বত ও সম্মানে যবেহ করা। (লেখক এ প্রকারকে বড় শির্ক-এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এটি বড় শির্ক যেমন জ্বীন বা কবরবাসীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবেহ করা।
- মুবাহ : মেহেমান দারী বা ব্যবসায়িক বা অন্য কোন কাজে যবেহ করা। এটা বৈধ।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করে, তাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের হয়ে যাবে।

শাফায়ত-এর প্রকারভেদ

যে বিষয়ে মানুষ ক্ষমতাবান তা চারটি শর্তের আলোকে জায়েয

(ক) ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে হবে।
(খ) জীবিত থাকতে হবে।
(গ) ক্ষমতাবান হতে হবে।
(ঘ) সুপারিশ প্রার্থনাকারী এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে সুপারিশকারী একটি মাধ্যম মাত্র।

যে বিষয়ে কেবল আল্লাহই ক্ষমতাবান এটি দুই প্রকার ঃ

শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত : ঐ শাফায়াত যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রকার শাফায়াত কেবল আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে।
(ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াতের অনুমতি থাকা।
(খ) সুপারিশকারীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।
(গ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতিও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

শাফায়াত কর্তৃক সাব্যস্ত নয়। এটি ঐ শাফায়াত যা কুরআনুল কারীম বাতিল সাব্যস্ত করেছে। আর তা হলো যে বিষয়ে কেবল আল্লাহই ক্ষমতাবান তা গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এটা বড় শির্ক।

যা নবী (সঃ) এর জন্যই নির্দিষ্ট
(১) সুমহান সুপারিশ
(২) নবী (সঃ) এর চাচা আবু তালিবের শাস্তি হালকা করার সুপারিশ।
(৩) জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়ার জন্য সুপারিশ।

এমন শাফায়াত যা নবী-রাসূল, ফেরেশ্তা, তাওহীদ পন্থী ও নিষ্পাপ শিশুদের জন্য প্রযোজ্য।
(১) তাওহীদ পন্থীদের মর্যাদা উঁচু করার জন্য সুপারিশ
(২) তাওহীদ পন্থীদের মধ্য হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নামে না দেয়ার সুপারিশ
(৩) তাওহীদ পন্থীদের মধ্য হতে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ।

কোন ব্যক্তির তার মুসলিম ভাইকে "আমার জন্য দু'আ করুণ" এ কথা বলা কি বিশুদ্ধ?

যদি এ দু'আ চাওয়ার ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষীতার ভাব থাকে তবে তা ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি দু'আ চাওয়া হয় জীবিত উপস্থিত সক্ষম ব্যক্তির কাছে ও দু'আ প্রার্থনা কারী এই বিশ্বাস করে যে সে (যার নিকট দু'আ চাওয়া হচ্ছে) একটি মাধ্যম মাত্র। তাহলে জায়েয হবে। তবে এটি বর্জন করাই উত্তম।

ঃ তাওয়াক্কুল ঃ

শরীয়ত সম্মত উপকরণ অবলম্বন এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তারই উপর একনিষ্ঠভাবে নির্ভর করাই হলো তাওয়াক্কুল।

বড় শির্ক : ইবাদত ও আনুগত্যের তাওয়াক্কুল। আর তা হলো কারো উপর নিরংকুশভাবে নির্ভর করা। এ ভাবে যে নির্ভর কারী মুখাপেক্ষীতার সাথে এই বিশ্বাস করবে যে নির্ভর যোগ্য ব্যক্তির হাতে উপকার করার ও অপকার করার ক্ষমতা রয়েছে। যেমন মৃতদের উপর নির্ভর করা। এ প্রকার তাওয়াক্কুল একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে এই প্রকার তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত করা হলে তা বড় শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। [লেখক এই প্রকারকে বড় শির্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন]।

ছোট শির্ক : তা হলো মুখাপেক্ষীতার সহিত জীবিত কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা। যেমন রিযিক অবলম্বনের ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তিকে উপকরণের উপরে মনে করা।

৩। জায়িয : তা হলো কোন প্রকার মুখাপেক্ষীতা ছাড়া জীবিত কোন ব্যক্তির উপর অর্পিত বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করা। যেমন তুমি কোন কিছু বিক্রয়ের দায়িত্ব অর্পন করলে।

"আমি অমুকের উপর তাওয়াক্কুল করলাম" অথবা "আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম অত:পর অমুকের উপর" এধরণের কথা বলা বৈধ হবে কী? এ ক্ষেত্রে সঠিক রূপরেখা কি?

"আমি অমুকের উপর তাওয়াক্কুল করলাম" বলা বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে "আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম অত:পর অমুকের উপর" এ কথাও বলা বৈধ নয়। কেননা এটি অন্তর সংশ্লিষ্ট বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে সঠিক রূপরেখা হলো তুমি বলবে আমি অমুকের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছি। কেননা স্বয়ং রাসূল (সঃ) কতিপয় সাহাবীকে তার সাধারণ ও বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

তৃতীয় ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে করেনা, অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কাফির হয়ে যাবে।

"ইসলামে মুশরিকদের বিধান "

যার কাছেই নবী (সঃ) এর দাওয়াত পৌঁছেছে অথচ সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি সে বড় কুফুরীতে লিপ্ত অর্থাৎ সে কাফের। আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ "আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না, অতএব পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" [সূরা আল ইমরান-৮৫]

আহলে কিতাব কি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবে?

হ্যাঁ যে সকল আহলে কিতাব নবী (সঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত। দলিল আল্লাহ বলেন: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করেনা যে গুলোকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্যের দীন গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত তারা নিজ হাতে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত না হয়।" [সূরা তাওবা-২৯] নবী (সঃ) বলেছেন ঐ সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রাণ, এই উম্মতের যে কেউ সে ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক আমার রেসালাতের কথা শুনার পরেও আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি বিশ্বাস না করেই মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামী।

এ কথার অর্থ কি আমরা মুশরিকদের সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার পূরণ করব না?

আমাদের জন্য আবশ্যক হলো তাদের সাথে করা ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করা, যাতে করে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আল্লাহ বলেন : فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "তারা যে পর্যন্ত তোমাদের সাথে (চুক্তিতে) সরল ভাবে থাকবে, নি:সন্দেহে আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। [সূরা তাওবা-৭]

মুশরিকদের সাথে লেনদেন ভিত্তিতে মানুষ তিন প্রকার ঃ

এক শ্রেণী অতিরঞ্জন করে : তারা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার ও ধর্মীয় সভায় অংশ গ্রহণ করে থাকে।

অপর শ্রেণী তাদের উপর অত্যাচার করে : তাদেরকে হত্যা করে, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের প্রহার করে।

এই দুই শ্রেণীর মাঝে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান অর্থাৎ আমাদের অবস্থান: আমরা তাদের অনুষ্ঠান, সেমিনার ও ধর্মীয় সভায় অংশগ্রহণ করিনা। তাছাড়া তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করি। তাদের সাথে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেন করি। এবং তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করি।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী চতুর্থ বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস পোষণ করেন যে, নবী (সঃ) এর আদর্শের চেয়ে অন্য আদর্শ আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ অথবা তাঁর হুকুমের চেয়ে অন্যের হুকুম বেশি উত্তম। (ঐ সকল লোকদের মত যারা তাগুতের হুকুমকে রাসূলের হুকুমের উপর প্রাধান্য দেয়) সে কাফির হয়ে যাবে।

“আল্লাহর বিধানের বিপরীতে ফায়সালা করার প্রকারভেদ”

আল্লাহর ফায়সালার উপর তাগুতের ও সংবিধানের ফায়সালা এই বিশ্বাসের সাথে প্রাধান্য দেয়া যে, আল্লাহর ফায়সালা বর্তমান সময়ের জন্য উপযোগী নয়। যদি কোন ব্যক্তি এ ধরণের বিশ্বাস করে তবে সে কাফির আল্লাহ বলেন: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা তওবা-৩১]

আর যদি কেউ এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা আবশ্যক এবং তা দেশ ও দেশের জনগণের জন্য অধিক উপযোগী। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে অথবা নেতৃত্বের লোভে বা কোন স্বার্থের জন্য তাগুতের ফায়সালাকে প্রাধান্য দেয় তবে তা ছোট কুফর ও পাপ কাজ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি এই ফায়সালার মাধ্যমে কোন মুসলিমের অধিকার খর্ব হয় তাহলে সে যালেম। এ ধরণের ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত হতে বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী পঞ্চম বিষয় ঃ

রাসূল (সঃ) এর আনীত কোন হুকুমকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে ঐ হুকুম অনুযায়ী আমল করে।

"ইসলাম বিধ্বংসী এ বিষয়ের সমর্থনে দলিল"

আল্লাহর বাণী ঃ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٩ "এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সে কারণে আল্লাহ তাদের আমল নিষ্ফল করে দিবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ-৯]

তিনি আরও বলেন: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٦٥ "অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যান্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসাবে মেনে না নেবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন ভাবে অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।" [সূরা নিসা-৬৫]

তিনি আরও বলেন :

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٢٥

"অতএব আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তকরণ খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ সংকুচিত করে দেন, এমন ভাবে সংকুচিত করেন যে মনে হয় যেন সে আকাশে আরহণ করেছে, এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আল্লাহ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতাকে বিজয়ী করে দেন।" [সূরা আনআম-১২৫]

আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং অপছন্দ করা

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন মুসলিম ভাইকে ভালবাসা অথবা ঘৃণা করা অন্যতম ওয়াজিব বিষয়। আর তা ঈমানের অন্যতম বন্ধন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে সকল বিষয় ভালবাসা অপরিহার্য সে গুলো কি?

- ঐ সকল আমল যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন। আর সে গুলো শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত। যেমন তাওহীদ।
- আমলকারীকে ভালবাসা। যেমন নবী-রাসূলগণ, ফিরিস্তা, সাহাবায়ে কেরাম ও প্রত্যেক তাওহীদ পন্থী ব্যক্তি।
- ঐ সময়কে ভালবাসা যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন। যেমন কদরের রাত, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।
- ঐ সকল স্থান ভালাবাসা যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন। যেমন মক্কা, মদীনা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য যে সকল বিষয় ঘৃণা করা অপরিহার্য সে গুলো কি?

- ঐ সকল আমল যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। আর তা এমন কতক কাজ যা শরীয়ত প্রণেতা নিষেধ করে-ছেন। যেমন শির্‌ক করা।
- আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সম্পাদনকারী। যেমন মুশরিক, মুনাফিক, শয়তান।
- এমন কতক সময় যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। যেমন সূর্যের পূজা করার সময়।
- এমন কতক স্থান যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। যেমন শির্‌ক সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহ।

যে মহিলা একাধিক বিবাহ করা অপছন্দ করে তাকে কি কাফের বলা যাবে?

মহিলা সাধারণত একাধিক বিবাহের শারঈ হুকুমকে অপছন্দ করেনা। বরং সে অপছন্দ করে, তার স্বামী একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক। সুতরাং এ বিষয়ের কারণে মহিলাকে তিরস্কার করা যাবেনা।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী ষষ্ঠ বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর দ্বীনের কোন বিষয়কে অথবা সওয়াব বা শাস্তি নিয়ে বিদ্রূপ করবে সে কাফির বলে বিবেচিত। এ কথার দলিল : আল্লাহ তা'য়ালার বাণী : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ "তুমি বলে দাও : তবে কি তোমরা আল্লাহ; তার আয়াত সমূহ তার রাসূলের প্রতি হাসি তামাশা করছিলে?" "ঈমান আনার পর তোমরা ওযর আপত্তি করনা" [সূরা তাওবাহ-৬৫-৬৬]

উপহাস কারী

উপহাসকারীর বিধান : উপহাসকারী অথবা গালমন্দ কারী কাফের। উপহাস করা এমন একটি কাজ যা উপহাস কারীকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামের অধিবাসী বানিয়ে দেয়। আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যে ব্যক্তি কাউকে শরীয়তের কোন বিষয় নিয়ে গালমন্দ করতে শুনবে তার জন্য অপরিহার্য হলো তা ঘৃণা করা অথবা ঐ মজলিস ত্যাগ করা। আর যে ব্যক্তি গালমন্দ দেয়া অবলোকন করবে বা কোন প্রকার অপছন্দ করা ছাড়াই তা বর্ণনা করবে সে ব্যক্তিও তার মতো কাফের। আল্লাহর তা'য়ালার বাণী : وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ "এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের কিতাবের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ কর, তখন তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথায় তোমরা তাদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে।" [সূরা নিসা-১৪০]

উপহাস কারীর তওবা নিম্নোক্ত শর্তের আলাকে কবুল করা হবে।

*আল্লাহ তা'আলার যথাযথ মর্যাদা আনুযায়ী প্রশংসা করা

* উপহাস করে যা বলেছে তা থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হওয়া।

* আর আচার আচরণে তওবার প্রভাব ফেলা যাতে আমরা তাকে সত্যবাদী বলে জানতে পারি। যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) কে গালি দিবে তার তওবা আল্লাহ তা'আলা নিকট গ্রহণ যোগ্য হবে, যদি সে সত্যবাদী হয়। তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে এই কাজের জন্য হত্যা করবে।

যখন কোন ব্যক্তির কথায় গালমন্দের ভাব প্রকাশ হয় তখন তাকে কাফের বলা যাবে কি?

ঐ ব্যক্তির কথা তার নিকট বর্ণনা করা হবে ফলে সে যদি তওবা করে তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দিবো অন্যথায় বিচারক ও বিজ্ঞ আলেমদের নিকট উপস্থাপন করবো।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী সপ্তম বিষয় ঃ

যাদু করা : যেমন এর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো বা এর মাধ্যমে প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করা। যে ব্যক্তি এ কাজ করল বা এ কাজের উপর সন্তুষ্ট থাকল সে কুফরী করল। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "আর তারা উভয়ে কাউকে এটা শিক্ষা দিতনা, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করনা।" [সূরা বাকারা-১০২]

যাদু

১. যাদুর হুকুম : যাদু করা বড় কুফরী। দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "আর তারা উভয়ে কাউকে এটা শিক্ষা দিতনা, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করনা।" [সূরা বাকারা-১০২]

২. যাদু কারীর আলামত :

* শারঈ ঝাড়ফুঁক বৈধ হওয়ার শর্তসমূহের বিপরীতে কাজ করা।
* হুরুফুল মুকাত্ত্বায়াত এবং বোধগম্য নয় এমন বাক্য লিখা।
* তারকা রাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করা, করকোষ্ঠী ও কাপ গণনা করা।
* ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে গিরা দেয়া।
* **রোগীকে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেয়া। যেমন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। সালাত ছেড়ে দেয়া অথবা পশু যবেহের সময় "বিসমিল্লাহ" ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি**
* রোগীর মাতার নাম জিজ্ঞাসা করা।
* গায়েবের জ্ঞান দাবী করা।

যাদুকারীর নিকট আগমন ও তার হুকুম

* যাদুকারীর নিকট আসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার সাথে চলাফেরা করা, অথবা তার নিকট লোক পাঠানো অথবা চিঠি পাঠানো। অনুরূপ ভাবে যে সকল টিভি চ্যানেল, পত্র পত্রিকা ও স্থানসমূহে রাশি, করকোষ্ঠী গণনা করা হয় তা দেখা যাদুকারীর নিকট আসার অন্তর্ভূক্ত।
* যাদুকারীর নিকট আসার বিধান হলো: যে ব্যক্তি তার নিকট আসবে তার ৪০ দিনের সালাত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি যাদুকারীর কথাকে সত্যায়ন করে তার ব্যাপারে নবী (সঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে এসে তার কথা সত্যয়ন করল সে মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করল। তবে যোগ্য ব্যক্তি জ্যোতিষীর বিরোধীতা করার জন্য আসলে সে এ হুকুমের আওতায় পড়বেনা।

“আন নুশরা”

আন নুশরা হলো যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট হতে যাদু দূর করা। এটা দুই প্রকার যথা :

১. শরীয়ত সম্মত : তা হলো শরীয়তসিদ্ধ ঝাড়ফুঁক, বৈধ ঔষধ ও দুয়ার মাধ্যমে যাদু দূর করা।

২. শরীয়ত নিষিদ্ধ : তা হলো যাদুর মাধ্যমে যাদু দূর করা। নবী (সঃ) বলেছেন “নিশ্চয় তা শয়তানের কাজ”।

য ব্যক্তি যাদুর মাধ্যমে যাদু দূর করা বৈধ বলে তার কথা নিম্নোক্ত কারণে অগ্রহণযোগ্য

১. যাদুর মাধ্যমে যাদু দূর করা কুরআন সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনদের নীতি বিরোধী।
২. এর দ্বারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ-তে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।
৩. এর দ্বারা যাদু ও যাদুকারীকে শক্তিশালী করা হয় এবং জন সাধারণের নিকট তাদের বিশেষ অবস্থান তৈরি হয়।
৪. এর দ্বারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের মতো সুনিশ্চিত বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে যাদুর মাধ্যমে চিকিৎসার ধারণাপ্রসূত বিষয়ের দিকে ধাপিত হওয়া হয়।
৫. যাদুগ্রস্থ ব্যক্তি ধৈর্য-ধারণ করলে বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।
৬. যাদুর মাধ্যমে যাদু দূর করার ফলে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির যাদু আরো বৃদ্ধি পায়।
৭. নবী (সঃ) কে যাদু করা হয়েছিল অথচ যাদুর মাধ্যমে তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেননি বরং শরীয়ত সিদ্ধ ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী অষ্টম বিষয় ঃ

মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা। এর দলিল আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয় সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা-৫১]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা।

মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো, মুশরিকদের থেকে এবং তাদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ও তা অস্বীকার করা। পাশাপাশি তাওহীদ পন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের দ্বীনকে মহব্বত করা উচিৎ। যে ব্যক্তি কুফরকে পছন্দ করবে অথবা তাতে সন্তুষ্ট হবে অথবা কুফর কে সাহায্য করবে বা মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে সে কাফের, সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। সর্বপরি আমরা বলবো মুশরিকদেরকে সাহায্য করা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. বড় কুফরী : তা হলো মুশরিকদেরকে ভালবেসে, মুসলিমদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে এবং মুসলমানদের উপর মুশরিকদের জয়ে উৎসাহী হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

২. বড় কুফরী নয় : মুশরিকদের ভালবাসা ও মুসলিমদের অপছন্দ করার জন্য এই সাহায্য নয় বরং দুনিয়ার স্বার্থে মুশরিকদের সাহায্য করা।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী নবম বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ) এর শরীয়াত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। যেমন খিজিরের জন্য মুসা (আ)এর শারীয়াত থেকে বের হওয়ার সুযোগ ছিল সে কাফির হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ) এর মিল্লাত থেকে বের হওয়ার সুযোগ রয়েছে

সে বিদ্যানগণের ঐক্যমতে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের কারী বড় কুফরীতে লিপ্ত। তাকে তওবা করতে বলা হবে এবং তার নিকট দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে। যদি সে তওবা করে তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا " হে মোহাম্মদ (সঃ) তুমি ঘোষণা করে দাও: হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।" [সূরা আরাফ-১৫৮]

নবী (সঃ) বলেছেন যদি আমার ভাই মূসা (আ:) আজ বেঁচে থাকতেন, তবে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া তারও কোন পথ থাকতো না। যে সকল আহলে কিতাবের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তারা এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তারা মুশরিক।

খিযির (আঃ) কি মূসা (আঃ)-এর উম্মত থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন?

খিযির (আঃ) কি মূসা (আঃ) এর উম্মত থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এ মর্মে কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। যদি এটা প্রমাণিত হয়, তবে হয়তো তিনি মুসা (আঃ) এর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীদেরকে তাদের গোত্রের নিকট পাঠানো হতো। আর আমাদের নবীকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানব জাতির নিকট। তাই কারো জন্য আমাদের নবীর শরীয়ত থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই।

ঃ ইসলাম বিধ্বংসী দশম বিষয় ঃ

আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। দ্বীন সম্পর্কে না জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা। এর সমর্থনে দলিল : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা : সাজদাহ-২২]

আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া

নবী (সঃ) বলেছেন "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন"। আর আল্লাহ যার কল্যাণ চান না সে কেবল আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে এবং উদাসীন থাকতে পারে। আল্লাহ বলেন : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা : সাজদাহ-২২] আর পাপীরাই জাহান্নমের অধিবাসী। [আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি]

আল্লাহর দ্বীন হতে বিমুখ হওয়ার বিধান

যদি কেউ হৃদয় থেকে পুরোপুরি ভাবে রাসূল (সঃ) থেকে বিমুখ হয়, এভাবে যে সে রাসূল (সঃ)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেনা এবং মিথ্যা প্রতিপন্নও করেনা, রাসূল (সঃ) কে পছন্দ করেনা আবার অপছন্দও করেনা। রাসূল (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা কখনো শ্রবণও করেনা তবে সে কাফের। আল্লাহ বলেন : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।" [সূরা নিসা-৬১] তিনি আরও বলেন : وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧) "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন।" [সূরা জ্বিন-১৭]

উপসংহার

ইসলাম বিধ্বংসী এ সকল কাজ উপহাসের সাথে করা হোক অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক অথবা ভয় করে করা হোক (ইসলাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে) এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে কাউকে জোর পূর্বক বাধ্য করা হলে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে না। এ গুলোর প্রতিটি কাজ অত্যন্ত বিপদজনক বা ভয়াবহ। এ সব কাজ সচরাচর ঘটে থাকে। তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ এ সমস্ত বিষয় থেকে সতর্ক থাকা এবং নিজে তাতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করা। আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় এমন বিষয় সমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সঃ) তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ইসলাম বিধ্বংসী এসকল বিষয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

উপহাসকারী: যে ব্যক্তি ইসলাম বিধ্বংসী কাজ করার পর বলে আমি উপহাস করছিলাম।

ইচ্ছাকৃত : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলাম বিধ্বংসী কাজ সম্পাদন করে। আর এ ক্ষেত্রে তার কোন ওযর থাকেনা।

ভীত : যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে যে কাজটি সে তার সম্মান অথবা সম্পদ ক্ষতি হওয়ার আশংকায় করেছিল। অথচ তাকে এই বিষয়ে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠)। "মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে; আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা কষ্টে পতিত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?" [সূরা আনকাবুত-১০]

ইকরাহ তথা বাধ্য করা ঃ

যাকে ইসলাম বিধ্বংসী কোন কাজ করতে বাধ্য করা হবে তাকে কাফের বলা যাবেনা। নিম্লোক্ত শর্তের আলোকে ইকরাহ গ্রহণযোগ্য হবে।

১. ব্যক্তিকে প্রকৃত বাধ্য হতে হবে। তাই ভীত-শঙ্কিত ও ভদ্রতা রক্ষাকারীর ওযর গ্রহণ যোগ্য হবে না।

২. ইকরাহর দোহাই দিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। যেমন কোন ব্যক্তিকে এমন একজন কে গালি দিতে বাধ্য করা হল, যাকে গালি দিলে কুফরী সাব্যস্ত হয়, বাধ্যকৃত ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে একাধিক জনকে গালি দিল। এটাই কুফরী কেননা তাকে একজনকে গালি দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে।

৩. কুফরী কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না করে সাধ্যমতে ইশারা ইঙ্গিতে বলবে।

৪. অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল রেখে শুধু মাত্র মুখে ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় প্রকাশ করবে।

৫. যে বিষয়ে বাধ্য করা হচ্ছে তা যেন কারো উপর যুলুম নির্যাতন অথবা মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার মাধ্যম না হয়।

গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১. লেখক (রহ) এই কিতাবের মাধ্যমে জাতিকে কাফের সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করেননি। বরং তার ইচ্ছা হলো মানুষ এই সকল বিষয় জানবে, এগুলো থেকে সতর্ক থাকবে এবং ভয় করবে। যখন মানুষেরা এ সকল বিষয় ভয় করবে তখন তাদের ঈমান পরিশুদ্ধ হবে এবং কিয়ামতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। অনুরূপভাবে তাদের উচিৎ হলো অন্যদেরকেও এসকল বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা। কেননা এগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয় যা জানা ও তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

২. শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই শির্ক থেকে বাঁচার ভয় সৃষ্টি হয়। নবী (সঃ) বলেছেন আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে গভীর জ্ঞান দান করেন। দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা অন্যতম অবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে শির্ক, বিদআত ও পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষের আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে ততই সে কাজ কর্মে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষ তার জ্ঞান যতই উন্নতি সাধন করবে ততই আল্লাহর প্রতি তার একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঈমান পরিপূর্ণ হবে। কিছু আলেম বলেছেন, আমরা গাইরুল্লাহর জন্য ইলম অন্বেষণ করলাম, অবশেষে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

৩. ইসলাম বিধ্বংসী কোন কাজে লিপ্ত হওয়া, তার নিকট দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তার থেকে তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয় গুলো দূর করা ছাড়া নির্দিষ্ট ভাবে কাউকে কাফের বলা যাবেনা। কাফের সাব্যস্ত করার দায়িত্ব হলো মুসলিমদের দায়িত্বশীল ব্যক্তির অথবা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিচারকদের। এ ধরণের কাজে সাধারণ লোকদের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

৪. লেখক (রহ) কিতাবটি নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন (আল্লাহর ক্রোধ ও পরকালের) যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আবশ্যক করে দেয় এমন বিষয়সমূহ থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা তাঁর সৎ উদ্দেশ্য ও পাঠকের প্রতি গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। লেখক (রহ) প্রত্যেক কিতাবেই এই নীতি অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা লেখক কে ক্ষমা করে দিন এবং পরিপূর্ণ সাওয়াব দিয়ে ধন্য করুন।

اختبر نفسك

নিজেকে পরীক্ষা কর ঃ

নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট স্থানে উত্তর দাও :

১। আলেমগণ কেন তাদের কিতাবকে “বিসমিল্লাহ” দ্বারা শুরু করেছেন?

(১)

....

(২) ....

(৩) ....

(৪) ....

২। “নাওয়াকেযুল ইসলাম” এর তাৎপর্য কি?

....

....

৩। আলেমগণ কেন ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় গুলোকে কখনো نواقض কখনো مفسدات আবার কখনো مبطلات দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

....

....

৪। ইসলাম বিধ্বংসী এ সকল বিষয়ের ব্যাপারে আলেমগণ কি একমত?

....

....

৫। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ?

....

....

৬। লেখক (রহ) কেন ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় দশটি বলেছেন?

....

....

৭। কিতাব ও সুন্নাহতে যখন ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ের সংখ্যা উল্লেখ্য করা হয়। তখন তার কোন বিশেষ তাৎপর্য থাকে কি? ফলে তার উপর বেশি করা যাবে না।

....

....

৮। কেন কখনো কখনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ্য করা হয়েছে? অথচ তার কোন তাৎপর্য নেই?

....

....

৯। নির্দিষ্ট সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, এর উদাহরণ দাও।

....

....

১০। নির্দিষ্ট সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্য নেই এর উদাহরণ দাও।

....

....

১১। লেখক (রহ) ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় দশটির বেশি রয়েছে বলে কি মনে করেন?

....

....

১২। লেখকের এ কথা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে?

....

....

১৩। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ কি সীমাবদ্ধ করা সম্ভব?

....

....

১৪। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়গুলো কিভাবে সীমাবদ্ধ করা হবে?

....

....

১৫। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়গুলো কেন আমরা অধ্যয়ণ করবো?

....

....

১৬। লেখক (রহ) ছাড়া ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ের উপর কেউ কি গ্রন্থ রচনা করেছেন?

....

....

১৭। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ং ইসলাম বিধ্বংসী কাজ ও তা সম্পাদন কারীর মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

....

....

১৮। পার্থক্যের কারণ কি?

....

....

১৯। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় উল্লেখ করণের মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তিকে কাফের বানানো লেখক (রহ) এর কি উদ্দেশ্য?

....

....

২০। ইসলাম বিধ্বংসী বিষয় অধ্যয়ণ কারীর করণীয় কি?

....

....

২১। লেখক (রহ) এর দ্বারা কোন শির্‌ক উদ্দেশ্য করেছেন?

....

....

২২। ছোট শির্‌ক ও বড় শির্‌ক-এর মাঝে কিভাবে আমরা পার্থক্য করব?

....

....

২৩। বড় শির্কে জড়িত ব্যক্তির তওবা কি কবুল করা হবে? আর কখন কবুল করা হবে না?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৪। ছোট শির্ক বড় গুনাহ না সবচেয়ে বড় গুনাহ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৫। বড় গুনাহ সমূহের নীতি কি?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৬। বড় গুনাহ গুলো কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৭। কাবীরাহ গুনাহকারীর হুকুম কী? তাকে ভালবাসতে হবে না ঘৃণা করতে হবে?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৮। কাবীরাহ গুনাহকারীর সাথে উঠাবসা বা চলাফেরা করা যাবে কী?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

২৯। কাবীরাহ গুনাহের বিভিন্ন স্তর আছে কি? তার দলিল কি?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

৩০। সৎ আমলের মাধ্যমে কাবীরাহ গুনাহ কি ক্ষমা হয়? না তার জন্য তওবা করা শর্ত?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

৩১। হারাম কাজ কত প্রকার?

....

....

৩২। বড় শির্কের প্রকার গুলো কি কি?

....

....

৩৩। যবেহের প্রকার গুলো কি?

....

....

৩৪। যবেহ করা কখন বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত হয়?

....

....

৩৫। শাফায়াতের প্রকার গুলো কি?

....

....

৩৬। তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

....

....

৩৭। তাওয়াক্কুল কত প্রকারে বিভক্ত?

....

....

৩৮। "অমুকের উপর তাওয়াক্কুল করলাম" অথবা "আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম অতপর অমুকের উপর" একথা বলা বিশুদ্ধ কি?

....

....

৩৯। "তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে কিরূপ কথা বলা উচিৎ?

....

....

৪০। মুশরিকগণ কাফের হওয়ার দলিল কি? আহলে কিতাব কি তাদের অন্তর্ভূক্ত?

....

....

৪১। এ কথার অর্থ কি আমরা মুশরিকদের সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার পূরণ করব না?

....

....

৪২। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারগুলো কি?

....

....

৪৩। আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফায়সালার প্রকারগুলো কি?

....

....

৪৪। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার হুকুম কি?

....

....

৪৫। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাকে ভালবাসব? আর কাকে ঘৃণা করব?

....

....

৪৬। ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী কোন প্রকার কুফরীতে লিপ্ত?

....

....

৪৭। ঠাট্টা-বিদ্রুপ কারীর তওবা করার সুযোগ আছে কি? তার শর্তগুলো কি?

....

....

৪৮। নবী (সঃ) কে গালমন্দকারীর হুকুম কী?

....

....

৪৯। গালমন্দ শ্রবণকারীর বিধান কি?

....

....

৫০। যাদুকারী কাফের হওয়ার দলিল কি?

....

....

৫১। যাদুকারীর আলামতগুলো কি কি?

....

....

৫২। যাদুকারীর নিকট আসার হুকুম কি?

....

....

৫৩। কিভাবে যাদুকারীর নিকট আসা হয়?

....

....

৫৪। নুশরার প্রকার গুলো কি কি?

....

....

৫৫। "যাদুর মাধ্যমে যাদু দূর করা বৈধ" একথা কিভাবে আমরা খন্ডন করবো?

....

....

৫৬। মুশরিকদের সাহায্য করার বিধান উল্লেখ কর।

....

....

৫৭। মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়ত থেকে বের হওয়ার কারো কি সুযোগ আছে?

....

....

৫৮। খিযির (আঃ) কি মূসা (আঃ) এর শরীয়ত থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন?

....

....

৫৯। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়ার বিধান কি?

....

....

৬০। লেখকের ভাষায় الخائف (ভীত) বলতে কি বুঝ? সে কি মুকরাহ?

....

....

৬১। "ইকরাহ" এর শর্ত গুলো কি?

....

....

৬২। দু'য়ার মাধ্যমে কিতাব সমাপ্ত করার তাৎপর্য কি?

....

....

৬৩। মুসলিম ব্যক্তি শির্ককে কিভাবে ভয় করবে?

....

....

সূচিপত্র

তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি		
১	ভূমিকা	৩-৭
২	চারটি মাসআলা	৮-১২
৩	তিনটি মাসআলা	১২-১৫
৪	তাওহীদ অধ্যয়নের গুরুত্ব	১৬
৫	তিনটি মূলনীতি	১৭-৫১
৬	শেষ কথা	৫১
৭	ছক আকারে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	৫২-৫৪
৮	তিনটি মূলনীতির পরীক্ষা	৫৫-৫৮

চারটি নীতি:		
১	ভূমিকা	৫৯-৬৫
২	প্রথম নীতি	৬৬
৩	দ্বিতীয় নীতি	৬৭-৬৯
৪	তৃতীয় নীতি	৬৯-৭০
৫	চর্তুথ নীতি	৭১
৬	ছক আকারে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী	৭২-৭৩
৭	চারটি নীতির পরীক্ষা	৭৪-৭৫
৮	সূচিপত্র	৭৬-৭৭

ব্যাখ্যমূলক ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ

১	ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ	৭৬-৭৮-
২	লেখকের ভূমিকা	৭৯-৮২
৩	ইসলাম বিধ্বংসী প্রথম বিষয়	৮৩-৮৫
৪	ইসলাম বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিষয়	৮৬-৮৭
৫	ইসলাম বিধ্বংসী তৃতীয় বিষয়	৮৮
৬	ইসলাম বিধ্বংসী চতুর্থ বিষয়	৮৯
৭	ইসলাম বিধ্বংসী পঞ্চম বিষয়	৯০-৯১
৮	ইসলাম বিধ্বংসী ষষ্ঠ বিষয়	৯২
৯	ইসলাম বিধ্বংসী সপ্তম বিষয়	৯৩-৯৪
১০	ইসলাম বিধ্বংসী অষ্টম বিষয়	৯৫
১১	ইসলাম বিধ্বংসী নবম বিষয়	৯৬
১২	ইসলাম বিধ্বংসী দশম বিষয়	৯৭
১৩	উপসংহার	৯৮
১৪	গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৯৯
১৫	প্রশ্নোত্তর	১০০-১০৭